POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবন্ধ করা হইল, যেরূপে তোমদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবন্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার। (আল বাকারা: ১৮৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 14

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 7 এপ্রিল, 2022 5 রমযান 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত আবু বাকার (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

১৭৯৪) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জোড়া খরচ করেছে, জান্নাতের দরজা থেকে তাকে আহ্বান করা হবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! এই (দরজা) উত্তম। সুতরাং, যে নামায পাঠকারী হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। জিহাদকারীকে জিহাদের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। রোযাদারকে রাইয়ান দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। সদকা প্রদানকারীকে সদকার দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। (একথা শুনে) হযরত আবু বাকার (রা.) বললেন: হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। যাদেরকে এই দরজাগুলি থেকে আহ্বান করা হবে, তার কি কি কোনও প্রয়োজন থাকবে না? এমন ব্যক্তিও কি কেউ আছে যাকে এই সমস্ত দরজাগুলি থেকে আহ্বান করা হবে? আঁ হযরত (সা.) বললেন: হ্যাঁ, আমি আশা করি, আপনিও তাদেরর অন্তর্ভুক্ত।

নোট: হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বলেন: 'জাওযাইন' বলতে প্রত্যেক প্রকারের জোড়াকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গো কিতাবুল জিহাদ, বাব ফাযলুন নাফকাতি ফি সাবিলিল্লাহ, রেওয়াতে নম্বর-২৮৪১ দ্রষ্টব্য।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুস সাউম)

জুমআর খুতবা, ৪ মার্চ, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

আমার সহজাত প্রবৃত্তির দাবি এই যে, সব কিছু যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

বন্ধুগণ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমি আমার জামাত এবং নিজের জন্যও এটিই চাই এবং পছন্দ করি যে, ভাষণের মধ্যে যে কথার আড়ম্বর থাকে আমরা যেন তাতেই তুষ্ট না পড়ি। আর বক্তা বিশেষের মনমুগ্ধকর ভাষণ ও শক্তিশালী ভাষার প্রতিই সমস্ত মনোযোগ ও লক্ষ্য যেন কেন্দ্রীভূত না হয়ে পড়ে। আমি এতে সন্তুষ্ট হই না। যাতে আমি সন্তুষ্ট হই- কৃত্রিমতা বশত নয়, বরং আমার সহজাত প্রবৃত্তির দাবি এই যে, সব কিছু যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়। যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাঁর আদেশাবলী পালন করা আমার উদ্দেশ্য না হত,তবে আল্লাহই ভাল জানেন যে, বক্তব্য দেওয়া এবং উপদেশ দেওয়া তো দূরের কথা, আমি সর্বদাই নির্জনতা প্রিয় আর নিঃসঙ্গাতায় এক অবর্ণনীয় আনন্দ লাভ করি। কিন্তু আমি কি করব! মানুষের সহানুভূতি আমাকে টেনে বের করে আনে, আর এটি আল্লাহ্‌র আদেশ, যিনি আমাকে তবলীগের কাজে আদিষ্ট করেছেন। কথার আড়ম্বর অপছন্দ করার বিষয়টি আমি একারণে বর্ণনা করেছি যে, প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়ে শয়তানের অংশ রাখা আছে। যদিও সৎ কর্মের উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া নিঃসন্দেহে অতি উৎকৃষ্ট কাজ, কিন্তু মানুষ যখন উপদেশ করার জন্য দাঁড়ায়, এই স্থানে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ভীত হওয়া উচিত যে, এর মধ্যে সুপ্তভাবে শয়তানেরও অংশ রয়েছে। কিছুটা উপদেশদাতার ভাগে আসে আর কিছুটা শ্রবণকারীদের ভাগে পড়ে। এর তাৎপর্য এই যে উপদেশ প্রদানকারী যখন উপদেশ দিতে দাঁড়ায়, তখন শ্রোতাদের মুগ্ধ করাই তাদের আন্তরিক বাসনা ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাদের লক্ষ্য থাকে এমন চোখা চোখা শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে চতুর্দিক থেকে মানুষের প্রশংসা কুড়োনো। আমার মতে এমন বক্তাদের এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন-বিদুষক, অভিনেতা, কাওয়াল গায়ক ও কণ্ঠশিল্পীরা শ্রোতাদের মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনতে মুখিয়ে থাকে।

তাই যখন বিপুল সংখ্যক শ্রোতা বক্তার সামনে থাকে, যাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বভাব ও মর্যাদার মানুষ থাকে- তখন খোদাকে দর্শন করার চোখটি উন্মুক্ত থাকে না, তবে ব্যতিক্রম সেই সব লোকেরা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা চান। অন্যথায়, অধিকাংশ বক্তাই লোকের প্রশংসা ও সাধুবাদ পেতে ব্যগ্র থাকে। যাইহোক, শয়তানের এই অংশটি বক্তার মধ্যে থাকে। আর শ্রোতাদের মধ্যে শয়তানের অংশটি তাদের সঙ্গো সম্পর্কিত যারা বক্তার বাগ্মিতা, ভাষার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, জোরালো অভিব্যক্তি, এবং কবিতা, কাহিনী এবং কৌতুকের যথোপযুক্ত প্রয়োগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, কেবল এটুকু বোঝাতে যে বক্তব্যটি তাদের কাছে বোধগম্য হয়েছে। মোটকথা তাদের উদ্দেশ্য খোদা থেকে বহু দূরে থাকে, আর বক্তার রয়েছে তার নিজের উদ্দেশ্য। তারা ভাষণ দেয়, কিন্তু খোদার কারণে নয়। আর এরা তাদের কথা শোনে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান দেয় না। কেননা তারা খোদার জন্য শোনে না। এমনটি কেন হয়? কারণ, যাতে তারা আনন্দ উপভোগ করে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬০-৩৬১)

এই কিতাব সমগ্র পৃথিবীর কাছে পৌঁছনো জরুরী। কেননা এটি সমগ্র পৃথিবীর জন্য নাযেল হয়েছে আর এটি সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ৪৪ নং আয়াত- এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ --- لِتُبَيِّنَ এর লাম 'লামে তালিল'ও হতে পারে আবার 'লামে আকিবাত'ও হতে পারে। 'লামে তালিল' হওয়ার ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, আমরা তোমার উপর অন্যান্য গ্রন্থের থেকে থেকে উৎকৃষ্ট গুণাবলী সম্পন্ন গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি সমগ্র জগতকে সেই বাণী শোনাও যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার উপর অবতীর্ণ হওয়া শিক্ষামালা এই কারণে উৎকৃষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লা এটিকে কোনও একটি নির্দিষ্ট জাতি বা যুগের মানুষের জন্য অবতীর্ণ করেন নি। বরং জাতি ও যুগ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। 'লামে আকিবাত' হওয়ার পরিস্থিতিতে অর্থ এই দাঁড়াবে যে, যেহেতু তোমার উপর উৎকৃষ্ট কিতাব নাযেল হয়েছে, তাই তুমি কিভাবে একে গোপন রাখতে পার? এই উৎকৃষ্ট কিতাব নাযেল এই কারণে হয়েছে যে, তুমি সমগ্র জগতকে এর দিকে আহ্বান করছ। যার উপর এমন কিতাব নাযেল হয়, সে কিভাবে চুপকরে বসে থাকতে পারে?

নুযযেলা ইলাইহিম বলার মাধ্যমে কাফেরদের

এরপর শেষের পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে পত্রযোগে প্রশ্ন করেন যে, কোনও এক আহমদী নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছেন, 'খাতাম হল রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম। তাই, কলেমা তাইয়েবায় মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্-র সঙ্গে খাতামান্নাবীঈন লিখতে কোনও অসুবিধা নেই। আহমদ রসুলুল্লাহ্ও লেখা যায় আর মুযাম্মিল এবং মুদাস্সিরও হুযুর (সা.)-এর নাম, এগুলিও লেখা যেতে পারে।' তাঁর এই কথাগুলি কি সঠিক?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০ শে অক্টোবর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন- আপনি চিঠিতে কোনও এক আহমদীকে উদ্ধৃত করে যে কথাগুলি লিখেছেন, তা যদি সত্যি হয় তবে তিনি ভুল বলেছেন। কলেমা তৈয়্যবায় কোনও পরিবর্তন হতে পারে, এমন অবস্থান জামাতে আহমদীয়ার নয়। হাদীসে যেখানেই কলেমা তৈয়্যবার বাক্য লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যেক স্থানে হুযুর (সা.)-এর নিজস্ব নাম ব্যবহৃত হয়েছে। হুযুর (সা.) অথবা সাহবারা কোনও স্থানেই কলেমা তৈয়্যবার বাক্যে হুযুর (সা.)-এর ব্যক্তিগত নামের পরিবর্তে তাঁর কোনও গুণগত নাম ব্যবহার করেন নি। এছাড়া এযুগের ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনী ও বক্তব্যে, সর্বত্র এই কলেমা তৈয়্যবাই বর্ণনা করেছেন, হুযুর (সা.)-এর কেবল ব্যক্তিগত নামটিকেই কলেমা তৈয়্যবায় লিখেছেন।

অতএব, এই ধরণের পরিবর্তন মৌলিকত্বের পরিপন্থী, এমনকি এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষারও পরিপন্থী। তাই প্রত্যেক আহমদীকে এই ধরনের বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন: সন্তানের পক্ষে পিতার দোয়া কিম্বা অভিশাপ গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া রাবোয়ার প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার ১০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে বলেন: হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত উভয় প্রকারের বর্ণনায় স্ব স্ব স্থানে সঠিক যা আমাদের পথপ্রদর্শন করছে। দুই প্রকারের সামনে রাখলে বিষয়টি এরকম দাঁড়াবে- যে ব্যক্তির দোয়া গ্রহণীয়াতার মর্যাদা রাখে, তার অভিশাপও গৃহীত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা একথা তো বলেন নি যে, কেবল দোয়া গ্রহণ করব, কিন্তু বদদোয়া গ্রহণ করব না।

আল্লাহ্ তা'লা পিতাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা পিতার দোয়াও গ্রহণ করেন আবার বদদোয়াও শোনেন। এই কারণেই কুরআন করীমে পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছে -

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

অর্থ: এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও।

তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখিও এবং বলিও,'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।' (বানী ইসরাঈল আয়াত: ২৪-২৫)

সুতরাং, এই হাদীসে হুযুর (সা.) আমাদেরকে পিতার দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার এবং তার অভিশাপ এড়িয়ে চলার উপদেশ দান করেছেন।

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক জানতে চান যে, সাফা ও মারওয়ায় দৌড়ের সময় পুরুষরা দৌড়লেও মহিলারা কেন দৌড়ে না? অথচ হযরত হাজরা সেই স্থানে দৌড়েছিলেন। এর কারণ কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২২ শে নভেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

হজ্জ এবং উমরার সময় সাফা এবং মারওয়ার মাঝে দৌড় যেখানে হযরত হাজরা এবং হযরত ইসমাঈল-এর কুরবানীর স্মরণে করা হয়, তেমনি হাদীসের গ্রন্থগুলি থেকে একথাও জানা যায় যে, হুযুর (সা.) শেষ উমরার সময় মক্কার কাফেরদের সামনে মুসলমানদের শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাহাবাদেরকে বায়তুল্লাহ্কে প্রথম তিন বার প্রদক্ষিণ করার সময় দৌড়নোর এবং বুক ফুলিয়ে দ্রুত পায়ে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। কেননা মক্কার কাফেরদের ধারণা ছিল, মদীনা থেকে আসা মুসলমানদেরকে সেখানকার জ্বর অনেক দুর্বল করে দিয়েছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ)

সুতরাং, হুযুর (সা.)-এর এর নির্দেশ এবং কাজ অনুসারে হজ্জ এবং উমরা সম্পাদানকারী পুরুষদের (যারা এর সামর্থ রাখে) জন্য প্রথম তিন বার প্রদক্ষিণ করার সময় এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে পরিক্রমা করার সময় দৌড়নো রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে ব্যক্তি এর সামর্থ রাখে না, তার জন্য দৌড়নো আবশ্যক নয়। যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (তিনি নিজের বয়োঃবৃদ্ধ হওয়া কারণে দৌড়নোর পরিবর্তে হাঁটছিলেন) কারো আপত্তি শুনে উত্তর দিয়েছিলেন, সাফা এবং মারওয়ার মাঝে আমি যে দৌড়ি তা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে দৌড়নো দেখে। আর এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি তাই দৌড়নোর পরিবর্তে হেঁটে চলি। আর রসুলুল্লাহ্ (সা.)কেও আমি দেখেছি তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে হেঁটে পরিক্রমা করেছেন।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল হজ্জ)

ফিকাহবিদগণের নিকট বায়তুল্লাহ্ পরিক্রমা এবং সাফা-মারওয়া পরিক্রমা করার সময় দৌড়নো পুরুষদের জন্য সুন্নত, মহিলাদের জন্য নয়। কেননা মেয়েদের জন্য পর্দা আবশ্যশ। মেয়েরা দৌড়লে এই আদেশ বজায় থাকবে না।

হযরত হাজরার পানির সন্ধানে ছুটোছুটি করার প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, সেটি ছিল নিদারুণ ব্যকুলতার অবস্থা। যখন প্রবল তেষ্টায় হযরত ইসমাইলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। এই কথার বর্ণনানও পাওয়া যায় যে, কিছু কিছু স্থানে তিনি দ্রুত হাঁটতেন আর কিছু কিছু স্থানে দৌড়তেন, যেভাবে কেউ অস্থির হয়ে কোথাও দ্রুত পৌছনোর জন্য দ্রুত পদবিক্ষেপ করে আবার ছুটেও যায়। হজ্জ এবং উমরার সময় মহিলাদের জন্য এমন ব্যকুলতার অবস্থা থাকে না। এছাড়াও হজ্জ এবং উমরার সময় মহিলাদের সঙ্গে পুরুষরাও থাকে। সেই কারণে এক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য মোটের উপর দ্রুত হেঁটে চলাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, যাতে এর দ্বারা হযরত হাজরার সুন্নতও অনুসৃত হয় আর তাদের পর্দার নির্দেশও বজায় থাকে।

প্রশ্ন: শিয়াপন্থীদের শোক মিছিলে খিদমতে খালক-এর উদ্দেশ্যে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদেরকে পানি পান করানোর বিষয়ে মাননীয় নাযিম সাহেব দারুল ইফতা রাবোয়া-র পক্ষ থেকে উপস্থাপিত একটি রিপোর্টের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ২২ শে নভেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠিতে লেখেন-

আমার মতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর নির্দেশ এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করেছে। এই ধরণের কাজে দিনক্ষণ নির্ধারণ করা বিদাত।তবে যদি কোন আহমদী নিজে কিম্বা কোনও জামাত সারা বছর ধরে খিদমতে খালক-এর মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকে আর বিভিন্ন ধর্ম এবং সংগঠনের শান্তিপূর্ণ মিছিলের জন্য সারা বছরই খিদমতে খালকের স্পৃহা নিয়ে এই ধরণের স্টল দেয়, তাহলে শিয়াপন্থীদের শোকমিছিলের জন্য এই ধরণের স্টল দিতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি এই কাজ কেবল শিয়াদের শোকমিছিলের জন্যই বিশেষভাবে করা হয় আর সারা বছর এমন কোন স্টল না দেওয়া হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে বিদাতের পর্যায়ে পড়ে। এই ধরণের বিদাত থেকে আহমদীদের সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর চিঠিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর যে উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন তা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ

হযরত কাযী জহুরুদ্দীন সাহেব আকমল (রা.) প্রশ্ন করেন যে, মহরম মাসের দশ তারিখে শরবত, চাল ইত্যাদি দ্রব্য যে বিতরণ করা হয়, তা যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পুণ্য লাভের আশায় করা হয়? এ বিষয়ে হুযুর (আ.)-এর নির্দেশন কি?

হুযুর (আ.) বলেন- এমন কাজের জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করা এক প্রকার বিদাতপ্রথা যা ক্রমেই মানুষকে শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই এর থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা এমন প্রথার পরিণাম শুভ হয় না। সূচনা হয়তো এই সদভাবনা নিয়ে হয়েছিল, কিন্তু এখন তা শিরকের রূপ ধারণ করেছে। তাই আমরা একটি অবৈধ আখ্যায়িত করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন প্রথা নির্মূল না হয়, ভ্রান্ত মতবাদ দূর হয় না।"

(বদর পত্রিকা, নম্বর-১১, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪ই মার্চ, ১৯০৭, পৃ: ৬)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর

জুমআর খুতবা

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মাঝে সেই বস্তু রেখে গেছেন যার মাধ্যমে তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে হিদায়াত দান করেছেন। আর তোমরা যদি একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখ, তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হিদায়াত দান করবেন। যেমনটি তিনি আঁ হযরত (সা.)কে হিদায়াত দান করেছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকাল ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত যার ব্যাপ্তিকাল প্রায় সোয়া দুই বছর ছিল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত যুগই খিলাফতে রাশেদার একটি সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ এবং স্বর্ণালী যুগ হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য ছিল। কেননা, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি ও বিপদাপদের সম্মু খীন হতে হয়েছে। পক্ষান্তরে অসাধারণ ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এবং কৃপার কল্যাণে হযরত আবু বকর (রা.)'র পরম সাহসিকতা, বীরত্ব , মেধা ও বিচক্ষণতায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই সমস্ত ভয়ভীতি ও বিপদাপদের কালোমেঘ কেটে যায় আর যাবতীয় শংকা নিরাপত্তায় বদলে যায় এবং অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের এভাবে দমন করা হয়েছে যে, খিলাফতের দোদুল্যমান ইমারত সুদৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ৪ মার্চ, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (৪ আমান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র খলীফা নির্বাচিত হওয়া সম্পর্কে মতভিন্নতা নিয়ে আলোচনা চলছিল। এ বিষয়ে তাবারীর ইতিহাসে লেখা আছে, সেসময় হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন, হে আনসারগণ! এ বিষয়ের (তথা খিলাফতের) নিয়ন্ত্রণ তোমরা তোমাদের করায়ত্তে রাখ কেননা, এরা (তথা মুহাজিররা) বর্ত মানে তোমাদের দয়ামায়ার ওপর নির্ভরশীল। কারও তোমাদের বিরোধিতা করার সাহস হবে না আর মানুষ তোমাদের মতের বিরুদ্ধে যাবে না। তোমরা সম্মানিত, ধনবান, সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিমত্তার অধিকারী, প্রতাপশালী, অভিজ্ঞ যুদ্ধংদেহী, নিভীক এবং সাহসী লোক। লোকেরা তোমাদের পথপানে চেয়ে আছে যে, তোমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। এখন মতবিরোধ করো না, নতুবা তোমাদের মতভেদ তোমাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের বিষয়টি তোমাদের জন্য বুমেরাং হবে। অতএব, এরা যদি তোমাদের কথা অস্বীকার করে অর্থাৎ, কুরাইশ মুহাজিররা যদি এ বিষয়টি অস্বীকার করে যা তোমরা এইমাত্র শুনলে, তাহলে একজন আমীর আমাদের মাঝ থেকে হবে এবং অন্যজন হবে তাদের মাঝ থেকে। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি অসম্ভব। এক খাপে দুই তরবারি থাকতে পারে না। আল্লাহ্র শপথ! আরবরা কখনো তোমাদেরকে আমীর হিসেবে মেনে নিবে না কেননা, তাদের নবী (সা.) তোমাদের গোত্রের নয় বরং ভিন্ন গোত্রের সদস্য। অবশ্য আরব, যাদের মাঝে নবুওয়্যত ছিল; তাদের বিষয় (কুরাইশদের) হাতে তুলে দিতে আরবদের কোন দ্বিধা থাকবে না আর তাদের মধ্য হতেই তাদের আমীর হওয়া উচিত। আর এ অবস্থায় আরবদের মধ্য হতে যদি কেউ সে ব্যক্তির নেতৃত্বকে মানতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তার বিপরীতে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট যুক্তি ও স্পষ্ট সত্যথাকবে। মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজত্ব ও এমারতের বিষয়ে কে আমাদের বিরোধিতা করতে পারে? আমরাই তঁ ার (সা.) বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন। নির্বোধ, পাপী অথবা নিজেকে ধ্বংসকারী ব্যতীত অন্য কেউ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে না। হুবাব বিন মুনযের (রা.) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা নিজেরা এ বিষয়ের নিস্পত্তি কর আর এ ব্যক্তি ও তার সমমনা দের কথায় সম্মত হয়ো না। এরা তোমাদের প্রাপ্য অংশও করায়ত্ত করতে চায়। আর এরা যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয় তবে তাদের সবাইকে নিজেদের এলাকা থেকে বের করে দাও। আর সব বিষয়ের বাগডোর নিজেদের হাতে নিয়ে নাও কেননা, আল্লাহ্র শপথ! তোমরাই এই এমারতের সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখ ও সবচেয়ে যোগ্য। যারা কখনো এ ধর্মে র অনুগত হওয়ার ছিল না, তোমাদের তরবারির জোরেই এ ধর্মের অনুসারী হয়েছে। আমি এসব কার্যক্রমের নিস্পত্তির দায়িত্ব নিজ হাতে নিচ্ছি কেননা, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গীন অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে আমার এমনটি করার অধিকারও রয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! যদি তোমাদের সম্মতি থাকে তাহলে আমি কাটছাঁট করে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, যদি এরূপ কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের ধ্বংস করে দিবেন। হুবাব (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, বরং তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা তারা যারা সর্বাগ্রে ধর্মের সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়েছ। এখন এমনটি যেন না হয় যে, তোমরাই সর্বপ্রথম এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করবে। এতে বশীর বিন সা'দ (রা.) বলেন, হে আনসারগণ! ইসলামের প্রারম্ভি ক যুগে মুশরিকদের সাথে জিহাদ ও ইসলাম ধর্মের সেবা করার যে সৌভাগ্য আমাদের লাভ হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও নবীর আনুগত্য ছিল। অন্যদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো আমাদের জন্য শোভনীয় নয় আর আমরা এর মাধ্যমে জাগতিক কোন স্বার্থসিদ্ধি করতে চাই না। এ বিষয়ে আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ রয়েছে। কান খুলে শোন! মুহাম্মদ (সা.) নিঃসন্দেহে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর জাতি নেতৃত্ব লাভের সর্বাধিক অধিকারী এবং যোগ্য। আমি খোদা তা'লার শপথ করে বলছি, এ বিষয়ে আমি কখনো তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হবো না। আল্লাহ্কে ভয় করো, তাদের বিরোধিতা করো না এবং এ বিষয়ে তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ো না।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

যাহোক, হযরত উমর (রা.) যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে, সুনানে কুবরা লিন্ নিসাঈ-তে বর্ণি ত আছে, সাকীফা বনূ সায়েদায় যখন আনসাররা বলল, একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং একজন হবে তোমাদের মধ্য থেকে, তখন, পূর্বে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) বলেন, একটি খাপে দু'টি তরবারি থাকতে পারে না আর এমনটি হওয়া সমীচীনও নয়। অতঃপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত ধরে নিবেদন করেন, এই তিনটি গুণাবলী কার? অর্থাৎ, اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থ: যখন সে অর্থাৎ, মহানবী (সা.) তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুশ্চিন্তা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন (সূরা আত্ তওবা: ৪০)। তাঁর (সা.) সঙ্গী কে ছিলেন? অতঃপর বলেন, اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ অর্থাৎ, যখন তারা দু'জন গুহায় ছিলেন। (সূরা তওবা: ৪০) এই দু'জন কারা ছিলেন? আবার হযরত উমর (রা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ, দুশ্চিন্তা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। মহানবী (সা.) ব্যতীত (আল্লাহ্) আর কার সাথে ছিলেন?

হযরত আবু বকর (রা.) না হলে আর কার সাথে ছিলেন বা আছেন? এটি বলে হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন এবং তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাও বয়আ'ত করে নাও। অতঃপর উপস্থিত লোকেরাও বয়আ'ত করে নিল।

(সুনানুল কুবরা লিন নিসাই, হাদীস নং ৭১১৯)

হযরত উমর (রা.)'র পর হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জাররাহ্ (রা.) এবং হযরত বশী র বিন সা'দ (রা.) বয়আ'ত করেন আর একইভাবে সব আনসার হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৩)(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৬)

ইসলামী সাহিত্যে এই বয়আ'ত 'বয়আ'তে সাকীফা' কিংবা 'বয়আ'তে খাস্সা' নামেও বিখ্যাত।

(তারিখুল খোলাফায়ের রাশেদীন, পৃ: ২২, ৩৬৭)

কতক রেওয়ায়েত-এ এমনও পাওয়া যায়, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন নি আবার অপর কতক রেওয়ায়েত থেকে এটিও পাওয়া যায় যে, তিনি অন্যান্য আনসারদের সাথে বয়আ'ত করেছিলেন। অতএব, তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, সমগ্র জাতির লোকেরা পালাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেছেন এবং হযরত সা'দ (রা.)-ও বয়আ'ত করেছিলেন।

(তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফত প্র তিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "দেখ! মহানবী (সা.)-এর ইন্তে কালের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর তা কতই না উত্তমভাবে হয়েছে। তাঁর (সা.) ইন্তে কালের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন। সে সময় আনসাররা চেয়েছিল, একজন খলীফা তাদের মধ্য থেকে হোক এবং আরেকজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে। একথা শুনতেই হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং অন্য কতক সাহাবী (রা.) তৎক্ষণাৎ সে স্থানে চলে যান যেখানে আনসাররা সমবেত হয়েছিল আর তিনি তাদেরকে বলেন, দেখ! দু'জন খলীফা বানানোর ধারণাটি ভুল। বিভক্তির মাধ্যমে ইসলাম উন্নতি করবে না। যাহোক না কেন খলীফা একজনই হবে। তোমরা যদি মতভেদ কর তবে তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, তোমাদের মানসম্মান ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে এবং আরবরা তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তাই তোমরা এমন কথা বলো না। কতক আনসার তাঁর (রা.) বিপরীতে যুক্তি উপস্থাপন করতে আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার ধারণা ছিল, হযরত আবু বকর (রা.) যেহেতু কথা বলতো পারেন না, তাই আনসারদের সামনে আমি বক্তৃতা করবো কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) যখন বক্তৃতা আরম্ভ করেন তখন তিনি সেসব যুক্তি-প্র মাণ উপস্থাপন করেন যা আমার মাথায় ছিল বরং এর চেয়ে দৃঢ় দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি দেখে আমি মনে মনে বলি, আজ এই বৃদ্ধ আমাকে পুনরায় পরাস্ত করল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, আনসারদের মধ্য থেকে কয়েকজন দণ্ডায়মান হয় এবং তারা বলে, হযরত আবু বকর (রা.) যা কিছু বলছেন তা সঠিক। মক্কার অধিবাসী ছাড়া আরবরা অন্য কারও অনুগত্য করবে না। অতঃপর একজন আনসারী আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহ্ তা'লা এ দেশে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁর আপন আত্মীয়স্বজন তাকে শহর থেকে দেশান্তরিত করে দিয়েছেন। তখন আমরা তাঁকে নিজেদের বাড়িতে স্থান দিয়েছি এবং খোদা তা'লা তাঁর কারণে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা মদীনাবাসী অজানা ছিলাম, লাঞ্ছিত ছিলাম কিন্তু এ রসূলের (সা.) বদৌলতে আমরা সম্মানিত হয়েছি এবং খ্যাতি লাভ করেছি। এখন তোমরা এ বিষয়কে যা আমাদেরকে সম্মানিত করেছে, যথেষ্ট মনে কর এবং অধিক লোভ করো না। এমন যেন না হয় যে, আমাদের এ কারণে কোন ক্ষতির সম্মু খীন হতে হয়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, দেখ! খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। অবশিষ্ট রইল কে খলীফা হবে? আমি বলবো,তোমরা যাকে চাও খলীফা বানাও। আমার খলীফা হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনি বলেন, আবু উবায়দাহ্ বিন জাররাহ্ এখানেই আছে তাকে রসূল করীম (সা.) আমীনুল উম্মত (উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তির) উপাধি দিয়েছিলেন। তোমরা তার হাতে বয়আ'ত কর। এছাড়া উমর আছেন, যিনি ইসলামের খাতিরে একটি নগ্ন তরবারি। তোমরা তার হাতেও বয়আ'ত করতে পার। হযরত উমর (রা.) বললেন, আবু বকর! একথা এখন থাকতে দিন। হাত এগিয়ে দিন, আমাদের বয়আ'ত নিন। হযরত আবু বকর (রা.)'র হৃদয়েও আল্লাহ্ তা'লা সাহস সঞ্চার করেন আর তিনি বয়আ'ত গ্রহণ আরম্ভ করেন।

(মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মারকাযিয়ার বাৎসরিক ইজতেমা (১৯৫৬) উপলক্ষ্যে ভাষণ, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ: ৪০২-৪০৩)

সাকীফা বনূ সায়েদায় গণ বয়আ'ত সম্পর্কে আরও লেখা আছে, মহানবী (সা.) সোমবার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লোকেরা সাকীফা বনূ সায়েদায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র হাতে বয়আ'ত গ্রহণ করেন। সোমবারে দিনের অবশিষ্টাংশ এবং মঙ্গলবার সকালেও মসজিদে গণবয়আ'ত হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, সাকীফা বিন বনূ সায়েদার বয়আ'ত হয়ে যাওয়ার পরের দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বসেন। সেখানে হযরত উমর দাঁড়ান এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র পূর্বে বক্তৃতা করেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলেন, হে লোকসকল! গতকাল আমি তোমাদের সামনে এমর্মে কথা বলেছি যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি। আমি এর উল্লেখ আল্লাহ্র কিতাবে কোথাও পাইনি আর মহানবী(সা.)ও আমাকে এ বিষয়ে কোন ওসীয়্যত করে যান নি। কিন্তু আমি মনে করতাম রসুলুল্লাহ্ (সা.) অবশ্যই আমাদের বিষয়াবলীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) বললেন, আমার ধারণা ছিল, আমরা প্রথমে মৃত্যুবরণ করব আর মহানবী (সা.) আমাদের সবার শেষে মৃত্যুবরণ করবেন এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মাঝে তা রেখেছেন যার মাধ্যমে তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে পথনির্দেশনা দিয়েছেন আর যদি তোমরা সেটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকেও পথনির্দেশনা দিবেন, যেরূপে তিনি মহানবী (সা.)-কে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'লা তোমাদের বিষয়াবলীকে এমন এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেছেন যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, যিনি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন এবং ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ এর সত্যায়নস্থল। অর্থাৎ, তিনি দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন যখন তারা উভয়ে গুহায় ছিলেন। অতএব, উঠ এবং তাঁর হাতে বয়আ'ত কর। অতএব, লোকেরা সাকীফার বয়আ'তের পর আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) গণ বয়আ'তের দিন একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্র শংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় আমাকে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত করা হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের সবা র চাইতে উত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তাহলে আমাকে সহযোগিতা কর আর যদি বক্রতা অবলম্বন করি তাহলে আমাকে সোজা করে দাও। সত্যতা হল, আমানত এবং মিথ্যা খিয়ানত। তোমাদের মধ্য থেকে দুর্বল ব্যক্তিও আমার কাছে শক্তিশালী যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্যদের কাছ থেকে তার অধিকার আদায় না করে দিই এবং তোমাদের শক্তিশালী ব্যক্তিও আমার কাছে দুর্বল যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে অন্যদের অধিকার না আদায় করি, ইনশাআল্লাহ্। যে জাতি আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদকে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে লাঞ্ছি ত করেন এবং যে জাতির মাঝে পাপাচার বিস্তার লাভ করে আল্লাহ্ তাদেরকে বিপদে নিপতিত করেন। আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য কর আর যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করি তাহলে তোমাদের জন্য আমার আনুগত্য আবশ্যক নয়। নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও। আল্লাহ্ তোমাদের সবার প্রতি কৃপা করুন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯৮-২৯৯)

হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে হযরত আলী (রা.)'র বয়আ'ত করা সম্পর্কেও বিভিন্ন কথা বলা হয়ে থাকে। ইতিহাসগ্রন্থ তাবারীতে লিখা আছে, হাবীব বিন আবু সাবেতের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) বাড়িতেই ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে বলে, হযরত আবু বকর (রা.) বয়আ'ত নেয়ার জন্য বসেছেন। তখন হযরত আলী (রা.) জামা পড়া অবস্থায় ছিলেন, আর এতদ্রুত বেরিয়ে পড়েন যে, পাজামাও ছিল না এবং কোনো চাদরও ছিল না। কেননা তিনি অপছন্দ করতেন যে, কোথাও আবার দেরি না হয়ে যায়। এভাবে তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করেন এবং তাঁর পাশে বসে পড়েন আর এরপর তিনি নিজের কাপড় আনিয়ে সেই কাপড় পরিধান করেন হযরত আবু বকর (রা.)'র বৈঠকেই বসে থাকেন।

(তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে হযরত আলী (রা.)'র বয়আ'ত করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) ছয় মাস পর্যন্ত বয়আ'ত করেন নি আর হযরত ফাতেমা (রা.)'র মৃত্যুর পর বয়আ'ত করেন। অথচ কোনো

কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে ও অধীর আগ্রহের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে বয়আ'ত করেছিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাজির ও আনসাররা হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করে নেওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) মিম্বরে আরোহণ করেন আর লোকদের প্রতি তাকিয়ে সেখানে তিনি (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেখতে পান নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আনসারদের মধ্যে থেকে কয়েকজন লোক গিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসেন। [হযরত আলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে] হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, (হে) মহানবী (সা.)-এর চাচার পুত্র এবং তাঁর জামাতা! আপনি কি মুসলমানদের দুর্বল করতে চান? উত্তরে হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা! কঠোর হাতে পাকড়াও করবেন না আর এরপরই তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন আলি বিন আবি তালিব, পৃ: ১১৯) (আসসীরাতুন নাবুয়্যাহ লি ইবনে কাসীর, পৃ: ৬৯৩)

আল্লামা ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্র থম দিন অথবা দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেছিলেন। আর এটিই সত্য কথা, কেননা হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে কখনোই ত্যাগ করেন নি আর হযরত আবু বকর (রা.)'র পেছনে নামায পড়াও কখনো তিনি (রা.) পরিত্যাগ করেন নি।

আসসীরাতুন নাবুয়্যাহ লি ইবনে কাসীর, পৃ: ৬৯৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু প্রথম দিকেহযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করতে বিলম্ব করেছিলেন। কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার পর আল্লাহই জানেন তার মনে কী ধারণার উদয় হয় যে, পাগড়ীও বাঁধেন নি আর কেবল টুপি পরেই তাৎক্ষণিকভাবে বয়আ'ত করার জন্য চলে আসেন এবং পরে পাগড়ী আনিয়ে নেন। মনে হয় তার হৃদয়ে এই চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকবে যে, এটি তো অনেক বড় পাপ আর এজন্যই এত তাড়াহুড়া করেন যে, পাগড়ী না বেঁধেই তাৎক্ষণিকভাবে বয়আ'ত করার জন্য এসে যান আর পাগড়ী পরে আনান।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখুন! তিনি (রা.) মক্কার একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি আবির্ভূত না হতেন আর মক্কার ইতিহাস রচনা করা হত তাহলে ঐতিহাসিকরা শুধু এতটুকু উল্লেখ করত যে, আবু বকর (রা.) আরবের একজন ভদ্র ও সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণের ফলে আবু বকর (রা.) সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন যার জন্য সমগ্র বিশ্ব তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করে। মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন আর মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাদের খলীফা ও বাদশাহ্ বানিয়ে নেয় তখন মক্কাতেও এই সংবাদ পৌঁছে যায়। একটি বৈঠকে অনেক লোক বসেছিল যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন শুনতে পান মানুষ হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেছে তখন তার জন্য এ বিষয়টি মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি সংবাদদাতাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন আবু বকরের কথা বলছ? উত্তরে সে বলে, সেই আবু বকর যে আপনার পুত্র। সে আরবের এক-একটি গোত্রের নাম নিয়ে বলতে থাকে যে, তারাও আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করে নিয়েছে। আর যখন সে বলে, সবাই সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলীফা ও বাদশাহ্ নির্বাচন করে নিয়েছে তখন আবু কোহাফা অবলীলায় বলে উঠে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্যনেই, তিনি এক-অদ্বিতীয় তঁ ার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সত্য রসূল ছিলেন।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, "যদিও তিনি অনেক পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলেন,অর্থাৎ, হযরত আবু কোহাফা পুবেই মহানবী (সা.)-এর বয়আ'ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে এই কলেমা পু নরায় পাঠ করেন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রিসালতের স্ব ীকৃতি প্রদান করেন তা এই জন্য যে, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর তার চোখ খুলে যায় আর তিনি বুঝতে পারেন, এটিই হল ইসলামের সত্যতার এক শক্তিশালী প্রমাণ। অন্যথায় আমার পুত্রের কী এমন যোগ্যতা ছিল যে, তঁ ার হাতে গোটা আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।"

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০৫-২০৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এ ঘটনাটির উল্লেখ এভাবে করেছেন যে, দেখ! ইসলামগ্রহণের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র কী-ইবা গুরুত্ব ছিল। তিনি (রা.) যখন খলীফা হন তখন তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন। কেউ একজন গিয়ে তাকে সংবাদ দেয়, আপনাকে অভিনন্দন,আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন আবু বকর? উত্তরে সেই ব্যক্তি বলে, আপনার পুত্র। একথা শুনেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি, বরং তিনি বলেন, অন্য কেউ হবে হয়তো। কিন্তু যখন তাকে নিশ্চিত করা হয় তখন তিনি বলেন, আল্লাহু আকবর। মুহাম্মদ (সা.)-এর মহিমা অসাধারণ! আবু কোহাফার পুত্রকে আরবরা তাদের নেতা মনোনীত করেছে। মোটকথা, সেই আবু বকর (রা.) যিনি জগতে কোনো বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণে এত সম্মানের অধিকারী হয়েছেন যে, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদেরকে তাঁর প্রতি আরোপ করে গর্ববোধ করে।" (আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৫, জলসা সালানা ১৯১৯ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, "নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ! আল্লাহ্ তা'লা কখনো কারও ঋণ রাখেন না। মানুষ আল্লাহ্র জন্য যা কিছু কেউ দেয় এর চেয়ে শতসহস্র গুণবরং লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করে তিনি তা (ফিরিয়ে) দেন। দেখ! হযরত আবু বকর (রা.) মক্কায় সাধারণ একটি বাড়ি ছেড়ে এসেছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এর কত বেশি মূল্যায়ন করেছেন! এর বিনিময়েতিনি তাকে একটি সাম্রাজ্যের অধিকারী বানিয়েছেন।"(হাকায়েকুল ফুরকান, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪৪)

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফত সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর একটি সত্যস্বপ্ন ও রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, "স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়, আমি একটি কূঁ পের চর্কায় লাগানো বালতি দিয়ে পানি উঠাচ্ছি, এমন সময় আবু বকর এসে এক কিংবা দুই বালতি পানি এমনভাবে উঠান যে, তার উঠানোর মাঝে স্পষ্ট দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার দুর্বলতা ঢেকে দিবেন এবং তাকে মার্জনা করবেন। এরপর উমর বিন খাত্তাব আসেন আর সেই বালতিটি একটি বড় বালতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি এমন শক্তিশালী কাউকে দেখি নি যে এমন বিস্ময়কর কাজ করতে পারে যেমনটি উমর করেছে।তিনি এত পানি উঠান যে, মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায় আর নিজ নিজ অবস্থানস্থলে গিয়ে বসে পড়ে"।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু আসহাবিন নাবী, হাদীস- ৩৬৮২)

হযরত আবু বকর (রা.)'র (নিজের)ও একটি সত্য স্বপ্ন রয়েছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়, হযরত আবু বকর (রা.) একবার স্বপ্নে দেখেন, 'তাঁর গায়ে একটি ইয়েমেনী কাপড়ের পোশাক রয়েছে কিন্তু এর বুকের ওপর দুটি দাগ রয়েছে।' হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট এ স্বপ্ন টি বর্ণনা করলে তিনি (সা.) বলেন, ইয়েমেনী পোশাকের অর্থ হল, তুমি সুসন্তান লাভ করবে আর দু ই দাগের অর্থ হল, দুই বছরের শাসনক্ষমতা, অর্থাৎ তুমি দু'বছর মুসলমানদের শাসক থাকবে।

(কুনযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ৫ম ভাগ, পৃ: ২৫৩)

খিলাফত নির্বাচনের পর হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য ভাতা নির্ধারণ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, খিলাফতের (নির্বাচনের) পর তিনি মদীনায় চলে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। তিনি (রা.) তাঁর দায়িত্বাবলী সম্পর্কে চিন্তা করেন আর বলেন, খোদার কসম! ব্যবসাবাণিজ্য করে জনসাধারণের বিষয়াদির সমাধান করা সম্ভব নয়। এই কাজের জন্য অবকাশ ও পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রয়োজন। অপরদিকে আমার পরিবার-পরিজনের চাহিদাও কিছুটা পূরণ করতে হবে। তাই তিনি (রা.) ব্যবসা ছেড়ে দেন এবং বায়তুল মাল থেকে নিজের এবং পারিবারিকপ্রয়োজনে দৈনিক খরচাদি গ্রহণ করতে আরম্ভ। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ৬ হাজার দিরহাম মঞ্জুর করা হয়। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৪)

অতএব, বায়তুল মাল থেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য এতটা ভাতা নির্ধারণ করা হয় যা দিয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলে তিনি (রা.) তাঁর আত্মীয়স্বজনকে এমর্মে আদেশ দেন যে, বায়তুল মাল থেকে আমি যে ভাতা গ্রহণ করেছি তার সবটুকুই যেন ফিরিয়ে দেয়া হয় আর এটি পরিশোধের জন্য যেন আমার অমুক অমুক জমি বিক্রি করে দেয়া হয় এবং আজ পর্যন্ত আমি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মুসলমানদের যতটুকু ধনসম্পদ ব্যয় করেছি এই জমি বিক্রি করে যেন সেই অর্থের পুরোটাই পরিশোধ করা হয়। অতএব, তাঁর তিরোধানের পর হযরত উমর (রা.) খলীফা হন আর তাঁর কাছে সেই অর্থ পৌঁছালে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলেন, হে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)! আপনি আপনার স্থলাভিষিক্তের কাঁধে অনেক বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১২২, বুক কর্ণার, ঝিলম)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) গোটা মুসলিম জাহানের বাদশাহ্ ছিলেন, কিন্তু তিনি কী পেতেন? জনগণের অর্থসম্পদের রক্ষক তিনি (রা.) ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে এই অর্থের কর্তৃত্ব রাখতেন না। নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর (রা.) অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তিনি (রা.) যেহেতু অর্থ হাতে আসতেই তা আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিতে খুবই অভ্যস্ত ছিলেন তাই ঘটনাচক্রে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পরতিনি (রা.) যখন খলীফা হন তখন তার কাছে কোন নগদ অর্থ ছিল না। খিলাফতের দ্বিতীয় দিনই তিনি (রা.) কাপড়ের পুটলিটি উঠিয়ে তা বিক্রির উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি (রা.) বলেন, এ কী করছেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমাকে তো খেয়ে বাঁচতে হবে। কাপড় বিক্রি না করলে আমি খাব কোথা থেকে? হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি তো হতে পারে না। আপনি যদি কাপড় বিক্রি করতে থাকেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব পালন কে করবে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, আমি যদি একাজ না করি তাহলে চলবে কীভাবে? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, বায়তুল মাল থেকে আপনি ভাতা নিন। জবাবে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো এটি সহ্য করতে পারব না। বায়তুল মালে আমার কী অধিকার? হযরত উমর (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআন যেখানে এ অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে, যারাধর্মীয় কাজ করে তাদের জন্য বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় করা যাবে তাহলে আপনি কেন নিতে পারবেন না? অতএব, তাঁর জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারিত হয় কিন্তু সে যুগের প্রেক্ষিতে সেই ওযিফা কেবল এতটুকুই ছিল যা দিয়ে শুধু খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা পূরণ হতে পারত।"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৮)

খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকাল ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত যার ব্যাপ্তিকাল প্রায় সোয়া দুই বছর ছিল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত যুগই খিলাফতে রাশেদার একটি সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ এবং স্বর্ণালী যুগ হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য ছিল। কেননা, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি ও বিপদাপদের সম্মু খীন হতে হয়েছে। পক্ষান্তরে অসাধারণ ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এবং কৃপার কল্যাণে হযরত আবু বকর (রা.)'র পরম সাহসিকতা, বীরত্ব , মেধা ও বিচক্ষণতায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই সমস্ত ভয়ভীতি ও বিপদাপদের কালোমেঘ কেটে যায় আর যাবতীয় শংকা নিরাপত্তায় বদলে যায় এবং অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের এভাবে দমন করা হয়েছে যে, খিলাফতের দোদুল্যমান ইমারত সুদৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

খিলাফতের প্রথম দিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে যেসব বিপদাপদ ও সমস্যার সম্মু খীন হতে হয়েছে তার উল্লেখ হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)ও করেছন, এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার পিতা যখন খলীফা মনোনীত হন এবং আল্লাহ্ তাঁকে কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করেন তখন খিলাফতের সূচনাতেই তিনি সব ধরনের ফিতনা-ফাসাদকে ফুঁসে উঠতে এবং নবুয়্যতের ভণ্ড দাবীদারদের কর্মকাণ্ড আর মুনাফিক ওমুরতাদদের বিদ্রোহকে দেখেছেন। আর তাঁর ওপর এত বিপদাপদ এসে আপতিত হয়েছে যে, এসব যদি পাহাড়ের ওপর পতিত হতো তাহলে তা তৎক্ষণাত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো আর মাটির সাথে মিশে যেত কিন্তু তাঁকে রসূলদের ন্যায় ধৈর্য দেয়া হয়েছে এমনকি অবশেষে আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে এবং ভণ্ড নবীকে হত্যা করা হয়েছে আর মুরতাদদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। নৈরাজ্য দূরীভূত করা হয়, বিপদাপদ কেটে যায় আর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং খিলাফতের বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেন এবং তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করেন এবং এক জগতকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। নৈরাজ্যবাদিদের চেহারা কালিমালিপ্ত করেনএবং নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি আপন বান্দা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাহায্য করেছেন, বিদ্রোহী নেতৃবর্গ ও প্রতিমাসমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছেন আর কাফিরদের হৃদয়ে এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যে, তারা পিছপা হতে বাধ্য হয়েছে আর অবশেষে তারা ফিরে এসে তওবা করেছে আর এটিই মহাপ্রতাপান্বিত খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল আর তিনি সত্যবাদিদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদি ছিলেন। অতএব, প্রণিধান করে দেখ, খিলাফতের প্রতিশ্রুতি কীভাবে সকল অনুষঙ্গ এবং লক্ষণসহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সত্তায় পূর্ণ হয়েছে। "

(সিররুল খিলাফা, অনুবাদ, পৃ: ৪৯-৫০, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৫)

হযরত আবু বকর (রা.)-কে সূচনাতেই নিম্নবর্ণিত পাঁচ ধরনের দুঃখবেদনা ও সংকটের সম্মু খীন হতে হয়। প্রথম: মহানবী (সা.)-এর তিরধান ও বিচ্ছেদের বেদনা। খিলাফত নির্বাচন ও উম্মতের মাঝে নৈরাজ্য ও বিভাজনের আশঙ্কা। উসামার সেনাবাহিনী প্রেরণের বিষয়। চতুর্থ, মুসলমানহয়েও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ও মদীনায় আক্রমণকারী, যেটি ইতিহাসে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের নৈরাজ্য হিসাবে পরিচিত। পঞ্চম, মুরতাদের ফিতনা অর্থাৎ এমনসব বিদ্রোহী ও নৈরাজ্যবাদী যারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ঘোষণা করে দেয়। এই বিদ্রোহে হ তারাও যোগদান করে যারা নবী হওয়ার দাবী করেছে।

ভয়-ভীতির এহেন পরিস্থিতিতে বিপদাপদ ও নৈরাজ্য দূরীকরণে হযরত আবু বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যে সফলতা প্রদান করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরবো। কিন্তু এর পূর্বে ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি বিশদ উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যেখানে তিনি (আ.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম খলীফা হযরত ইউশা বিন নূনের সাথে তুলনা করে হযরত আবু বকর (রা.) যেসব সমস্যাদি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হন এবং যেসব, বিজয় ও সফলতা লাভ করেছেন তার উল্লেখ করতঃ তিনি (আ.) বলেন,যে আয়াতের মাধ্যমে উভয় ধারার অর্থাৎ, মূসাঈ খিলাফতের ধারা এবং মুহাম্মদী খিলাফতের ধারার মাঝে সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ, যে আয়াত দ্বারা নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে বুঝা যায় যে, মুহাম্মদী নবুয়্যতের ধারার খলীফাগণ মুসাঈ নবুয়্যতের ধারার অনুরূপ ও সাদৃশ্য পূর্ণ সেই আয়াতটি হল,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ সেসব মু 'মিন যারা সৎকর্ম করে, তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তাদের মধ্য থেকে পৃথিবীতে খলীফা নির্বাচন করবেন, সেই খলীফাদের অনুরূপ যাদেরকে তাদের পূর্বে (নির্বাচন) করেছিলেন (সূরা আন্ নূর: ৫৬)। যখন আমরা 'অনুরূপ' শব্দটিকে দৃষ্টিপটে রেখে বিষয়টিকে দেখি, যা মূসায়ী খলীফাদের সাথে মুহাম্মদী খলীফাদের সাদৃশ্য আবশ্যক করে দেয়, তখন আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয় যে, এই দু'টি উম্মতের খলীফাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক। আর সাদৃশ্যের প্র থম ভিত্তি স্থাপনকারী হলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এবং সাদৃশ্যের শেষ বহিঃপ্রকাশ হলেন, সেই মসীহ্ যিনি মুহাম্মদী ধারার খাতামুল খোলাফা, আর যিনি মুহাম্মদী খিলাফতের ধারার সর্বশেষ খলীফা। সর্বপ্রথম খলীফা, হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি হলেন হযরত ইউশা' বিন নূনের বিপরীতে ও তার সদৃশ যাকে আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর খিলাফতের জন্য বেছে নিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি বিচক্ষণতা তার মাঝে ফুঁকে দেন। এমনকি মসীহ্‌র জীবিত থাকার ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে খাতামুল খোলাফাকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, সেসব বিভ্রান্তি হযরত আবু বকর (রা.) পরম স্পষ্টতার সাথে সমাধান করে দিয়েছেন। আর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন সদস্যও এমন ছিলেন না যাদের বিগত নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) মৃত্যুর বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে নি। বরং সকল বিষয়ে প্রত্যেক সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)'র সেভাবেই আনুগত্য বরণ করেন, যেভাবে হযরত মূসার মৃত্যুর পর বনী ইস্রাঈল হযরত ইয়াশূ' বিন নূনের আনুগত্য করেছিল। আর আল্লাহ্‌ও মূসা ও ইয়াশূ' বিন নূনের আদলে যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং তাঁর সুরক্ষাকারী ও সমর্থন প্রদানকারী ছিলেন, তেমনিভাবেই আবু বকর সিদ্দীককে সাহায্য ও সমর্থন প্রদানকারী হয়ে যান।" [ইউশা' বিন নূন বা ইয়াশূ' বিন নূন একই কথা, একই নাম]।

(কামুসুল কিতাব, পৃ: ১১৪৪)

তিনি (আ.) বলেন, "বস্তুতঃ আল্লাহ্ ইয়াশূ' বিন নূনের মত এমনভাবে তাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন যে, কোন শত্রু তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে নি। আর উসামার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর অসম্পূর্ণ কাজ, যা হযরত মূসার অসম্পূর্ণ কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখতো, হযরত আবু বকরের হাত দিয়ে তা সম্পূর্ণ করেন। আর হযরত ইয়াশূ' বিন নূনের সাথে হযরত আবু বকরের আরেকটি আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য হল, হযরত মূসার মৃত্যুর সংবাদ সর্বপ্রথম হযরত ইউশা' জানতে পারেন এবং আল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ে ওহী অবতীর্ণ করেন যে, মূসা মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন ইহুদীরা হযরত মূসার মৃত্যুর বিষয়ে কোন ভ্রান্তি বা মতভেদে নিপতিত না হয়, যেমনটি ইয়াশূ'র পুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায়। একইভাবে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রকাশ করেন এবং তাঁর (সা.) পবিত্র দেহে চুম্বন করে বলেন, 'আপনি জীবিতাবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও পবিত্র।'

এরপর মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে কতিপয় সাহাবীর হৃদয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এক গণ-সমাবেশে কুরআন শরীফের আয়াতের বরাত টেনে খণ্ডন করেন।একইসাথে এই ভ্রান্ত ধারণারও মূলোৎপাটন করেন যা মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমূহে গভীর দৃষ্টিপাত না করার ফলে হযরত মসীহ্‌র জীবিত থাকার বিষয়ে কারও কারও মনে বিদ্যমান ছিল। যেভাবে হযরত ইয়াশূ' বিন নূন ধর্মের চরম শত্রু ও মিথ্যাবাদী এবং বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের ধ্বংস করেছিলেন, তেমনিভাবেই অসংখ্য বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ও মিথ্যা নবী হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে নিহত হয়। যেভাবে হযরত মূসা পথিমধ্যে এমন সংকটপূর্ণ সময়ে মৃত্যুবরণ করেন যখন বনী ইস্রাঈল কেনানবাসী শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করে নি এবং অনেকগুলো লক্ষ্য পূর্ণ হওয়া বাকি রয়ে গিয়েছিল আর চারপাশে শত্রুদের হৈ-হল্লা বিরাজমান ছিল এবং হযরত মূসার মৃত্যুর পর আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি ভাবেই আমাদের নবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এক ভয়ংকর যুগের সূচনা হয়। আরবের অনেকগুলো গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়, কতিপয় গোত্র যাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কয়েকজন মিথ্যা নবী দণ্ডায়মান হয়। এমন সময়ে, যা এক অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত, অটল-অবিচল, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ খলীফার দাবী রাখতো, আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। খলীফা হওয়ার পর পরই তাঁকে অনেক দুঃখবেদনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.)'র উক্তি রয়েছে যে, মরুবাসীদের সৃষ্ট বিবিধ প্রকার ফিতনা ও বিদ্রোহ এবং ভণ্ড নবীদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠার কারণে আমার পিতার ওপর যখন তিনি রসূল (সা.)-এর খলীফা মনোনীত হন তখন যেসব বিপদাপদ আপতিত হয়েছে এবং যেসব দুঃখ-কষ্ট তাঁর হৃদয়ে আপতিত হয়েছে সেসব দুঃখ-কষ্ট যদি কোন পাহাড়ের ওপর পতিত হত তাহলে তা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভূমির সাথে মিশে যেতো। কিন্তু যেহেতু, খোদা তা'লার এ রীতি হল, যখন খোদার রসূলের মৃত্যুর পর তাঁর কোন খলীফা মনোনীত হয় তখন তাঁর (খলীফার) মাঝে বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা এবং হৃদয়ের দৃঢ়তার প্রেরণা ও চেতনা তার মাঝে ফুঁকে দেওয়া হয়। যেমন, (বাইবেলের) ইশূর প্র থম অধ্যায়ের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা হযরত ইউশা'কে বলেন, দৃঢ় হও এবং সাহস দেখাও অর্থাৎ, মূসা (আ.) মারা গেছেন এখন তুমি দৃঢ় হয়ে যাও। এই একই আদেশ শরীয়তের আদলে নয় বরং তকদীদের সিদ্ধান্ত হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)'র হৃদয়েও অবতীর্ণ হয়েছিল। পারস্পরিক সাদৃশ্য ও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, আবু বকর বিন কোহাফা এবং ইউশা' বিন নূন একই ব্যক্তি।

খিলাফতের সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোন থেকে স্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যতা প্রকাশ করেছে। এটি এ কারণেও যে, দু 'টি দীর্ঘ সিলসিলা বা ধারার মাঝে পরস্পর সাদৃশ্য যারা দেখে থাকে তারা স্বভাবতই এই রীতি অনুসরণ করে যে, হয়ত প্রথমকে দেখে বা শেষকে। কিন্তু দুই সিলসিলার মধ্যবর্তী সাদৃশ্য- যার গবেষণা এবং অনুসন্ধান বেশি সময়ের দাবী রাখে সেটি দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না বরং প্রথম এবং শেষটির মাধ্যমেই কিয়াস বা অনুমান করে নেয়। এজন্য খোদা তা'লা ইউশা' বিন নূন এবং আবু বকরের তথা উভয় খিলাফতের প্রথম বিকাশের মাঝে এবং হযরত ইসা ইবনে মরিয়ম ও এই উম্মতের মসীহ্ মওউদ তথা উভয় খিলাফতের শেষ সিলসিলায় যে সাদৃশ্য রয়েছে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। উদাহারণস্বরূপ, ইউশা' এবং আবু বকরের মাঝে সেসব সাদৃশ্য রাখা হয়েছে যেন তাঁরা একই সত্তা অথবা একই মানিক্যের দু'টি টুকরো। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর বনী ইস্রাইল জাতি ইউশা' বিন নূন এর কথার অনুগত হয়ে গিয়েছিল আর কোন ধরনের মতভেদ করেনি বরং সবাই নিজ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে একই ঘটনা হযরত আবু বকরের বেলায়ও ঘটেছে আর সবাই মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে অশ্রু ঝরিয়ে সাগ্রহে হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেছে। মোটকথা, সকল দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবু বকরের সাথে হযরত ইউশা' বিন নূন (আ.)-এর সাদৃশ্য প্রমাণিত। খোদা তা'লা হযরত ইউশা' বিন নূনকে সাহায্য করেছেন যেরূপে হযরত মূসাকে সাহায্য করতেন তদ্রুপ খোদা তা'লা সমস্ত সাহাবীর সামনে হযরত আবু বকর (রা.)-র কাজে বরকত প্রদান করেছেন এবং নবীদের মত তিনি সাফল্য পেয়েছেন।

তিনি (রা.) খোদার পক্ষ থেকে শক্তি এবং প্রতাপ পেয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং মিথ্যা নবী দাবীকারকদের হত্যা করেছেন যাতে সাহাবীরা (রা.) জানতে পারেন যে, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে খোদা ছিলেন তদ্রুপ তাঁর সাথেও আছেন। আরেকটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য হযরত আবু বকর এবং ইউশা ' বিন নূন এর মাঝে রয়েছে আর তা হল , হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত ইউশা' বিন নূনকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একটি ভয়ঙ্কর নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল যার নাম জর্ডান নদী; জর্ডানে তখন ঝড় ছিল যার কারণে তা পার হওয়া অসম্ভব ছিল আর যদি সেই ঝড়ের মধ্যে পার না হতো তাহলে শত্রুদের হাতে বনী ইস্রাইলীদেরধ্বংস অনিবার্য ছিল। আর এটি প্র থম সেই ভয়ংকর বিষয় ছিল যা হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত ইউশা' বিন নূনকে তার খিলাফতের যুগে সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সে সময় খোদা তা'লা এই ঝড়ের কবল থেকে অলৌকিকভাবে ইউশা' বিন নূন ও তার সৈন্য-সামন্তকে রক্ষা করেছিলেন আর জর্দান নদী শুকিয়ে যায় কারণে তারা অতি সহজেই তা অতিক্রম করে। সেই শুষ্কতা জোয়ার-ভাটার আদলে ছিল বা কোন অলৌকিক নিদর্শনও হতে পারে। যাহোক, এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেই ঝড় এবং শত্রুদের নিপিড়ন থেকে তাদের রক্ষা করেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর সত্য খলীফা হযরত আবু বকরকে সাহাবীদের পুরো জামাত সহ যা এক লাখের বেশি ছিল, সেই ঝড়ের ন্যায় বরং তার থেকেও ভয়াবহ ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অর্থাৎ, দেশে চরম বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে আর আরবের সেসব বেদুঈন, যাদের সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেছিলেন, قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (সূরা আল্ হুজুরাত: ১৫) এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাদের বিকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল, যাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এই আয়াতের অর্থ হল, মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি বলে দাও যে, তোমরা ঈমান আনয়ন কর নি, বরং বল যে, আমরা মুসলমান হয়েছি, কেননা ঈমান এখনও তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, অতএব এমনটিই ঘটে আর তারা সবাই মুরতাদ হয়ে যায় এবং কিছু লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় আর কিছু লোক (মিথ্যা) নবুয়্যতের দাবী করে বসে; যাদের সাথে কয়েক লক্ষ দুর্ভাগা মানুষ যোগদান করেন। আর শত্রুদের সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, সাহাবীদের জামা'ত তাদের সামনে কোন গুরুত্বই রাখতো না। দেশে এক ভয়ানক ঝড় দেখা দেয় আর এই ঝড় সেই ভয়ানক পানির চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল হযরত ইউশা' বিন নূন (আ.)-এর। যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর তিরোধানের পর অকস্মাৎ হযরত ইউশা' বিন নূন চরম পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ নদীতে ভয়াবহ ঝড় উঠেছিল আর কোন জাহাযও ছিল না, চতুর্দি ক থেকে শত্রুর আশঙ্কা ছিল, হযরত আবু বকর (রা.)ও একই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অর্থাৎ , মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন এবং আরবদের মুরতাদ হওয়া ঝড়ের রূপ ধারণ করে আর মিথ্যা নবীদের আরেকটি ঝড় সেটিকে আরও শক্তিশালী করতে থাকে। এই ঝড় ইউশা'র ঝড়ের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না, বরং অনেক জোরালো ছিল। এছাড়া যেভাবে খোদার বাণী হযরত ইউশা'কে শক্তি যোগায় এই বলে যে, তুমি যেখানে যেখানে যাও আমি তোমার সাথে থাকি। তাই অবিচল থাক এবং সাহসী হও আর নিরাশ হয়ো না। তখন ইউশা'র মাঝে অনেক শক্তি ও অবিচলতা ও সেই বিশ্বাস জন্মে যা খোদার আশ্বস্ত করার ফলে জন্ম নেয়। একইভাবে বিদ্রোহের ঝড়ের সময় হযরত আবু বকর (রা.) খোদা তা'লার কাছ থেকে শক্তি লাভ করেন। সেই যুগের ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যে ব্যক্তি অবগত সে সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, সেই ঝড় এত ভয়াবহ ছিল যে, খে াদার সাহায্য যদি আবু বকর (রা.)'র সাথে না থাকত আর ইসলাম সত্যিকার অর্থে খোদার পক্ষ থেকে না হতো এবং আবু বকর (রা.) সত্য খলীফা না হতেন, তাহলে সেদিনই ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

কিন্তু ইউশা' নবীর মতো খোদার পবিত্র বাণী দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শক্তি লাভ করেন। কেননা, খোদা তা'লা পূর্বেই এই বিপদ বা পরীক্ষা সম্পর্কে পবি ত্র কুরআনে সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে সে নিশ্চিত বিশ্বাস করবে যে, নিঃসন্দেহে এই বিপদের সংবাদ পূর্বে ই পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছিল আর সেই সংবাদটি হল এই যে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

(সূরা আন্ নূর: ৫৬)

অর্থাৎ, খোদা তা'লা সংকর্মশীল বিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে খলীফা বানাবেন, পূর্বে মনোনীত খলীফাদের মতো আর সেই খিলাফতের ধারার ন্যায় সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করবেন, যা মূসার (মৃত্যুর) পর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং (এই আয়াতের) কিছুটা তফসীরি বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন। তিনি

(আ.) বলেন, সেই খিলাফতের সিলসিলার ন্যায় সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করবেন, যা মূসার (মৃত্যুর) পর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর তাদের ধর্মকে, অর্থাৎ তাঁর মনোনীত ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন এবং এর শিকড় প্রোথিত করে দিবেন এবং ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। দেখ! এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভয়ভীতির যুগও আসবে আর শান্তি হারিয়ে যেতে থাকবে কিন্তু খোদা তা'লা সেই ভয়ভীতির যুগকে পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। অতএব,একই ভীতির সম্মুখীন ইউশা' বিন নূন-এরও হতে হয়েছিল। আর যেভাবে তাকে খোদার বাণীর মাধ্যমে আশ্বস্ত করা হয়েছিল সেভাবেই হযরত আবু বকর (রা.)-কেও খোদার বাণীর মাধ্যমে আশ্বস্ত করা হয়েছে।"

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৮৩-১৮৯)

ইনশাআল্লাহ্ এই পাঁচটি বিষয়ের বাকি বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে তুলে ধরা হবে।

বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন (কেননা) এ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। এখন তো পারমাণবিক যুদ্ধেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি আর বহুবার বলেছি যে, এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। কেবল আল্লাহ্ তা'লাই তাদের বিবেকবুদ্ধি দান করতে পারেন।

এই দিনগুলোতে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করুন, অনেক বেশি এস্তেগফার করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পাপসমূহ-ও ক্ষমা করুন এবং বিশ্বনেতাদের বিবেকবুদ্ধি দিন ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তকে (কোন) এক সময় বিশেষভাবে নসীহত করেছিলেন যে, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল্ বাকারা: ২০২) দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করুন। আর {তিনি (আ.)} বলেছিলেন যে, রুকুর পর দঁাড়িয়ে এই দোয়া পাঠ করুন।বর্তমানে এই দোয়টিও বেশি বেশি পাঠ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা (সবাইকে তাঁর) কল্যাণরাজিতে ভূষিত করুন এবং সকল প্র কার আগুনের আযাব থেকে সবাইকে রক্ষা করুন।

আজ আমি একটি গয়েবানা জানাযাও পড়াব, যা সিরিয়া নিবাসী মুকার্ রম আবুল ফারাজআল্ হুসনী সাহেবের। তিনি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, নব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার পিতা মুকার্রম মুহাম্মদ আল্ হুসনী সাহেব প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন, যিনি মওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেবের মাধ্যমে বয়আ'ত গ্রহণ করেছিলেন। আবুল ফারাজআল্ হুসনী সাহেব সিরিয়া জামা'তের প্রথম আমীর মুকার্রম মুনীর আল্ হুসনী সাহেবের ভাতিজা ছিলেন এবং তার এমারতকালে তিনি নায়েব আমীর হিসেবে জামা'তের সেবা করেছেন। এরপরও (তিনি) নায়েব আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৩৩ সালে (তিনি) জন্মগ্রহণ করেন এবং (তার) চাচা মুনীর আল্ হুসনী সাহেবের পুণ্য, খোদাভীতি ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বেশ প্রভাবিত ছিলেন। অধিকাংশ সময় তার বৈঠকে বসতেন। পনেরো বছর বয়সে একদিন রেডিওতে (কুরআন) তিলাওয়াত শুনে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যায় এবং তিনি কান্না করতে থাকেন। তার চাচার কাছে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে আরও জানতে চাই। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি পুস্ত ক তাকে প্রদান করেন। উক্ত পুস্তক পাঠের ফলে তার জগৎ বদলে যায় আর তিনি তার চাচার কাছে এসে বলেন, আমি বয়আ'ত করতে চাই। তিনি আহমদীয়া খিলাফতের তিনজন খলীফার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। ১৯৫৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন দামেস্ক সফরে যান তখন মরহুম তার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং (হুযূ রের) নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনেরও সুযোগ হয়। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সানিধ্যে রাবওয়ায় কয়েক মাস অবস্থান করে উর্দূ শেখার এবং জামা'তী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবারও সুযোগ লাভ করেন। সে বছরই তিনি পাকিস্তান থেকে কাদিয়ান যাওয়ারও সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি জলসা সালানা উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। এরপর ২০১৭সালে পুনরায় তার কাদিয়ান যাওয়ার সুযোগ হয় আর জলসায় তিনি আরবী ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও প্রদান করেন।

মরহুম অনেক নেক, পুণ্যবাণ, নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল বুযূর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিল না এবং তার স্ত্রীও অ-আহমদী।

সিরিয়া জামা'তের প্রে সিডেন্ট সাহেব বলেন, আমি ২০১৭ সালে তার সাথে কাদিয়ান দর্শনের জন্য যাই। যদিও তিনি অনেক দুর্বল ছিলেন কিন্তু তার উৎসাহ-উদ্দীপনার আতিশয্য এমন পর্যায়ে ছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি মাটিতে হাঁটছেন না, বরং বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছেন। অথচ পূর্বে এরূপ অবস্থা ছিল যে, অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে-ই চাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি যখন তাকে বলি যে, আপনি সেখান থেকে হয়ে আসুন তখন তিনি বলেন, যুগ খলীফার নির্দেশ যখন এসে গেছে অথবা তিনি বলেছেন যাও কোন চিন্তা নেই। এরপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন, তার এবং তার স্ত্রীর যে অসুস্থতা এবং দুর্বলতা ছিল, (তা থেকে) উভয়েই আরোগ্য লাভ করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা সেখানে যান, বরং মিনারাতুল মসীহ্তে চড়ার সৌভাগ্যও লাভ করেন আর বর্ণনাকারী বলেন যে, সেখানে যুবকদের চেয়ে দ্রুত তিনি উপরে উঠে যান, অথচ পূর্বে হাঁটতেও অসুবিধা ছিল।

ডাক্তার মুসাল্লাম দরোবি সাহেব লিখেন যে, মরহুম এক ওলীউল্লাহ্ এবং সিরিয়ার আবদালদের একজন ছিলেন। আমি নিজেও এবং অন্যান্য বন্ধুরাও এর সাক্ষী। তিনি দামেস্ক-এর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের একজন ছিলেন এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আর বাজারে তার সুখ্যাতি ছিল। মরহুম খুবই প্রজ্ঞাবান ও মেধাবী ছিলেন। রীতিমতো তাহাজ্জুদ পড়তেন। সত্য স্বপ্ন দেখতেন, তার বহু (স্বপ্ন) পূর্ণ হয়েছে। সেগুলোর মাঝে অনেকগুলো সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিপদাপদ সম্পর্কিতও ছিল। বিভিন্ন মুরব্বী যখন আরবী শিক্ষার জন্য সিরিয়ায় আসতেন তিনি তাদের খুবই সম্মান করতেন, তার কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তাদেরকে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত তারা তবলীগের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসামুন নকীব সাহেব, যিনি আজকাল তুরস্কে রয়েছেন, তিনি লিখেন, মরহুম বহু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা। মরহুমের সাথে করা কাদিয়ান সফর আমি সারা জীবন ভুলতে পারব না। এই সফরের প্রতিটি বিষয় এক নিদর্শন ছিল। আমি কাদিয়ানে সর্বক্ষণ তার সাথে ছিলাম। কাদিয়ানে তিনি একটি দোয়া-ই করতেন যে, হে খোদা! যুগ খলীফাকে সাহায্য ও সমর্থন কর, আর তার আয়ু এবং সকল কাজে বরকত দান কর। অতঃপর তিনি লিখেন যে, যখন সভায় কোন ব্যক্তি যুগ খলীফার কোন নির্দেশ বর্ণনা করত সেই সময় কাউকে কথা বলার অনুমতি দিতেন না যেন তিনি নির্দে শনা ভালোভাবে শুনে নিতে পারেন এবং বুঝতে পারেন এবং উপভোগ করতে পারেন। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। কারও কাছ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে আনন্দিত হতেন না, বরং তাকে ধমক দিয়ে বলতেন এসব কথা রাখ, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর জামা'তই সবকিছু, অতএব জামা'তের কথা বল। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক অধ্যয়ন করা কখনো পরিত্যাগ করেন নি। শেষ বছরগুলো ব্যতিরেকে, যখন তিনি খুবই দুর্ব ল হয়ে পড়েছিলেন, কখনো জামা'তী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা পরিত্যাগ করেন নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর তফসীরে কবীরের প্র তি তার গভীর আগ্রহ ছিল। যখন কেউ তার কাছে কোন কুরআনী আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করতো তখন তিনি তফসীরে কবীরের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন।

তার ভাগ্নে মুহাম্মদ আম্মারুল হুসনী সাহেব, যিনি এখানে যুক্তরাজ্যে আছেন, তিনি বলেন, আমার বয়স ছিল ১৪ বছর যখন আমি তার সাথে জুমআর নামাযে যেতাম। ফিরে আসার সময় তার সাথেই বাড়ি ফিরতাম আর পথে জামা'তী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতাম। তিনি বিস্তারিতভাবে সেগুলোর উত্তর দিতেন। সিরিয়ায় জামা'তী পুস্তকাদিও সহজলভ্য ছিল না। জামা'তের সদস্যদের জামা'তী শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে মরহুমের বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি যখন রাবওয়া গিয়েছিলেন, সেখানে উর্দূ পড়া শিখেছিলেন। তিনি উর্দূ বই পুস্তক নিয়ে আসতেন,উর্দূ বইপুস্তক পড়ে এবং বুঝে এরপর সেগুলো অনুবাদ করে জামা'তের সদস্যদের বলার চেষ্টা করতেন। মরহুম একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। কখনো পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন নি। সর্বদা খাদেম হিসেবে থাকতেই পছন্দ করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে আমীর নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি বলেন, মানুষ বলবে যে, পারিবারিকভাবে সবকিছু চলছে, আর এমারতের কাজও, তাই অন্য কাউকে নিযুক্ত করুন, আমি তার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করব। আর এরপর নিজের চেয়ে স্বল্প বয়সের আমীরের সাথে সহযোগিতা করেন আর পূর্ণ সহযোগিতা করেন, বরং এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার স্ত্রী'র অনুকূলে তার সকল দোয়া গ্রহণ করুন, আর তাকেও আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করুন।নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

****

নির্দেশ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, সুন্নীরা মহরমের দিনে বিশেষ ধরণের খাদ্য প্রস্তুত করে নিজেদের মধ্যে বিতরণ করে। এ সম্পর্কে নির্দেশনা কি?

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "এটিও এক প্রকার বিদাত, এগুলি খাওয়া উচিত নয়। এসব খাওয়া বন্ধ না হলে খাদ্য প্রস্তুত কিভাবে বন্ধ হবে? ..... কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ (আল বাকারা: ১৭৪)। এটিও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এমন লোকেরা পীর সাহেবের নামে পশু পালন করে।

(আল ফযল কাদিয়ান, দারুল আমান, ১০ম খণ্ড, নং ৩২, পৃ: ৬-৭, ২৩ শে অক্টোবর, ১৯২২)

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বিষয়ক দুটি হাদীস উল্লেখ করে জানতে চেয়েছেন যে এগুলি স্বামীদের জন্যও প্রযোজ্য কি না?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২২ শে নভেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন- প্রথম হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে আর স্ত্রী কোনও ক্ষোভের কারণে আসতে অস্বীকার করে, ফিরিশতারা তখন তার স্ত্রীর উপর সারা রাত অভিশাপ পাঠায়। মনে রাখবেন, এটি কেবল স্ত্রীদের জন্যই প্রযোজ্য নয়, ঠিক এর বিপরীতে স্বামীর জন্যও এই হাদীসটি প্রযোজ্য

এই হাদীস থেকে যদি কোনও দিকটি উন্মোচিত হয় তা এই যে, হুযুর (সা.) পুরুষের কামোদ্দীপনায় অস্থিরতার কারণে স্ত্রীকে কোনও বৈধ কারণ ছাড়া মিলনে অসম্মতি জানানোর বিষয়ে সতর্ক করেছেন। অন্যথায় যেভাবে স্বামীর অন্যান্য অধিকারের পাশাপাশি তার যৌন চাহিদা পূর্ণ করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যিক, অনুরূপভাবে স্ত্রীর অন্যান্য চাহিদার পাশাপাশি তার যৌনমিলনের অধিকার দেওয়াও স্বামীর কর্তব্য। সুতরাং,যদি কোন স্বামী একান্ত বাধ্যবাধকতা ছাড়া তার স্ত্রীর কামোদ্দীপনার সময় যৌনমিলনের অধিকার না দেয়, তবে সেও আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধী হবে, যেরূপে একজন স্ত্রী কোনও বৈধ কারণ ছাড়া তার স্বামীর কামেচ্ছা পূর্ণ করতে অস্বীকার করলে আল্লাহ্‌র অপ্রীতিভাজন হয়।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক বার হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)-এর স্ত্রী হুযুর (সা.)-এর সহধর্মিণীর নিকট উপস্থিত হন। মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণীগণ তাঁর দুর্দশা দেখে জানতে চান যে কি হয়েছে? কেননা কুরায়েশদের মধ্যে তাঁর স্বামীর চেয়ে বেশি ধনবান আর কেউ নেই। তিনি উত্তর দেন, এসবই তো আমার জন্য বৃথা। কেননা আমার স্বামীর দিন অতিবাহিত হয় রোযার মধ্য দিয়ে আর রাত্রি নামাযে। হুযুর (সা.) যখন তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট এলেন তখন তাঁরা এই বিষয়টির কথা উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, হুযুর (সা.) হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.))এর সঙ্গে সাক্ষাত করে (নিজের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন এবং) বলেন, 'তোমাদের জন্য কি আমি আদর্শ নই?' একথা শুনে হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.) বলেন, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, বিষয়টি কি? হুযুর (সা.)বললেন, তুমি রাত্রি নামায পড়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত কর আর রোযার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত কর। অথচ তোমার পরিবারেরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে, তোমার দেহেরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে। অতএব, নামাযও পড় আবার নিদ্রাযাপনও কর। রোযাও রাখ আবার রোযাহীন অবস্থায়ও থাক। বর্ণনাকারী বলেন,কিছু দিন পর সেই মহিলাই পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণীদের নিকট নববধুর ন্যায় রূপসজ্জা করে এবং সুগন্ধি মেখে উপস্থিত হয়। তাঁরা তাঁকে দেখে আনন্দিত হন। উক্ত মহিলা তাঁদেরকে বলেন, এখন আমারও সেই সব কিছু আছে যা অন্যদের আছে।

(মাজমুয়ায়েজ জোয়ায়েদ, কিতাবুন নিকাহ, বাব হাক্কুল মারআহ)

পূর্বোল্লিখিত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, বৈধ কারণ বা বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে এই কাজ করতে অসম্মতি জানালে কোনও পক্ষই আল্লাহ্ তা'লার অপ্রীতিভাজন হবে না। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,হুযুর (সা.) তবুকের যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধে যান, অপরদিকে যুদ্ধের জন্য রওনা হয়ে যাওয়া এক সাহাবী মদিনায় ফিরে আসেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে অগ্রসর হলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলেন- 'তোমার লজ্জা নেই! হুযুর (সা.) এমন ভীষণ গরমে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছেন আর তুমি এসেছ আমার কাছে প্রেম করতে?

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, পৃ: ৩৪৩-৩৪৪)

অতএব, কোনও পক্ষ যদি কোন কারণ বা বাধ্যবাধকতার কারণে অসম্মতি জানায়,তাহলে সে শাস্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু কোনও স্বামী বা স্ত্রী যদি অপরজনের কাছে এসে তাকে উত্তেজিত করার পর তাকে উত্যক্ত করতে তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তবে এমন ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টিভাজন হবে।

২) স্বামীর বাড়িতে অবস্থানকালে তার অনুমতিতে স্ত্রীর নফল রোযা রাখার বিষয়ে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে এই প্রজ্ঞা নিহিত আছে, ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারের বিষয়ে যত্নবান থেকেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারসমূহ ও কর্তব্যসমূহ ভাগ করে দেওয়ার সময় বাড়ির বাইরের সমস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদন এবং স্ত্রী ও সন্তানের মুখে অন্ন জোগানোর দায়িত্ব পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছেন। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা স্ত্রীর উপ সাংসারিক কাজের দায়িত্ব-যেমন, বাড়ির সম্পদ রক্ষা, স্বামীর চাহিদা পুরণ করা এবং সন্তানের লালন পালন করা- ন্যস্ত করেছেন।

স্বামী যখন নিজের কর্তব্য পালনের জন্য বাড়ির বাইরে পা রাখে, তখন স্ত্রীর জন্য সাংসারিক কাজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নফল ইবাদত করার বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু স্বামীর উপস্থিতিতে, যেহেতু তার চাহিদাবলী পূর্ণ করা স্ত্রীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই স্বামীর অধিকার প্রদান থেকে স্ত্রী যদি সাময়িক অব্যাহিত পেতে চায়, তবে স্বামীর অনুমতি নিয়েই সেই কাজ করা বাঞ্ছনীয়। হাদীসে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে এই নির্দেশের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

হযরত আবু সাঈদ (রা.)বর্ণনা করেন যেযয, হযরত সাফওয়ান বিন মুয়াতল (যিনি সারা রাত্রি শস্যখেতে কাজ করতেন আর দিনের বেলা বাড়িতে থাকতেন) -এর স্ত্রী হুযুর (সা.)-এর সমীপে অভিযোগ করেন যে, আমি নফল রোযা রাখলে আমার স্বামী রোযা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন।হুযুর (সা.) জিজ্ঞাসা করলে হযরত সাফওয়ান (রা.) বলেন, যখন সে রোযা রাখে, তখন নিয়মিত রোযা রেখেই চলে, আর আমি যেহেতু যুবক, তাই ধৈর্য্য রাখতে পারি না। বর্ণনাকারী বলেন, সেই দিন হুযুর (সা.) বললেন, কোনও মহিলা যেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া (নফল) রোযা না রাখে।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সাউম)

সারমর্ম এই যে, ইসলামী শিক্ষায় স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের অধিকার প্রদানের বিষয়ে, যার মধ্যে দৈহিক মিলনও রয়েছে, পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আর ইবাদতের কারণ দেখিয়ে একজনের অধিকার হরণ করার অনুমতি কোনও পক্ষকেই দেওয়া হয় নি। অতএব, যে পক্ষ কোনওভাবেই অপর পক্ষের অধিকার খর্ব করার দোষে দুষ্ট হবে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট সে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, দীপাবলীতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে যে খাবার দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে দেয় যে, 'এগুলি পুজো থেকে পৃথক রেখে দিচ্ছি।' আবার অনেকে কিছু না বলেই হাতে খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে চলে যায়। আমরা কি এই খাবার খেতে পারি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

যে খাবার হালাল বস্তু দিয়ে পরিস্কার বাসনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে শিরকের কোনও সংমিশ্রন নেই, সেই খাদ্য গ্রহণ করতে কোনও অসুবিধে নেই। এই সব বিষয় নিয়ে অত্যধিক খুঁতখুঁতে হওয়াও পছন্দনীয় নয়। তবুও এই সব খাদ্য গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পড়ে নেওয়া উচিত, যাতে খাদ্যে কোনও ত্রুটি থাকলেও আল্লাহ্‌র নামের কল্যাণে তার উপাচার হয়ে যায়। কেবল বিভ্রান্তি বশত কাউকে মনঃপীড়া দেওয়া থেকেও ইসলাম নিষেধ করেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হিন্দুদের বাড়ি থেকে আসা খাবার নিঃসংকোচে খেয়ে নিতেন, তাদের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে আসা শিরনিও গ্রহণ করতেন এবং খেয়ে নিতেন। হিন্দুদের হাতের খাবার খাওয়া কি উচিত- এক ব্যক্তির এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: শরিয়তে এটি বৈধ। এটিকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে ইসলাম জোর দেয় নি, বরং শরিয়ত قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এর উপর জোর দিয়েছে। আঁ হযরত (সা.) আর্মেনীয়দের হাতে প্রস্তুত খাদ্য নিঃসঙ্কোচে খেয়ে নিতেন আর এছাড়া চলাও তো যায় না।"

(আল হাকাম, নং ১৯, ৮ম খণ্ড, পৃ:৩, ১০ই জুন, ১৯০৪) ৪৪৪৪

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তেলাওয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর নিজেদের আকিদা এবং বর্তমান যুগের সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

মজলিসে উপস্থিত একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'লার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন- সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল, তোমরা সব সময় একথা স্মরণ রেখো যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে দেখছেন। তোমরা যা কিছু কর তা তিনি দেখছেন। যখন একথা তোমাদের মনে গেঁথে যাবে তখন তোমরা অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকবে আর আল্লাহ্ তা'লা যে সব কাজ করার আদেশ দিয়েছেন সেগুলি করার চেষ্টা করবে আর যেগুলি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নিউজিল্যাণ্ড সফর

সানডে স্টার টাইমস পত্রিকা সাংবাদিকের নেওয়া হুযুরের সাক্ষাতকার পর্ব।

সাংবাদিক মাউরি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন যে, এই অনুবাদের উদ্দেশ্য কি?

হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন: আমাদের উদ্দেশ্য হল সমগ্র জগতকে কুরআন করীমের বাণী পোঁছে দেওয়া। কুরআন করীম আরবী ভাষায় রয়েছে আর সকলে আরবী জানে না। তাই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটি প্রকাশ করেছি। এর পূর্বে পৃথিবীর একশটিরও বেশি ভাষায় কুরআন করীমের নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল, যার মধ্যে মাউরি ভাষাও ছিল। এখন আমরা সমগ্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছি। আমরা আফ্রিকাতেও কিছু স্থানীয় ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশ করেছি। এটি আমাদের এক ধারাবাহিক কর্মসূচির অঙ্গ বিশেষ।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, মাউরি জাতির লোকেদের মধ্য থেকে দুই-একজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁদেরকে চিনি না।

আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের বিশ্বাস হল কুরআন করীম শরিয়তের শেষ গ্রন্থ যা আঁ হযরত (সা.)এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলি এবং যে বার্তা মানুষের কাছে পোঁছে দিই তা কুরআন সম্মত। আমাদের বিশ্বাস, আমরা সঠিক পথে রয়েছি। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আর কুরআনের অক্ষরগুলি ছাড়া কিছুই থাকবে না। এটি হবে এক অন্ধকারময় যুগ। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা একজন সংস্কারককে আবির্ভূত করবেন, যার উপাধি হবে মসীহ ও মাহদী। তিনি মুসলমান জাতির মধ্য থেকে আসবেন এবং কুরআন করীমের শিক্ষা, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করবেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করবেন। আমরা বিশ্বাস করি, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী মসীহ ও মাহদী সেই সকল নিদর্শন সহকারে এসে গেছেন যা আঁ হযরত (সা.) তাঁর আগমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) আগমণকারী মসীহর সত্যতার জন্য যে সমস্ত নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলির মধ্য থেকে একটি হল রমযান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হওয়া। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি (আ.) মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করলেন এবং যথারীতি জামাত আহমদীয়ার গোড়া পত্তন করলেন, তখন তাঁর দাবির পর ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে রমযান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হল। অতঃপর ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে রমযান মাসের নির্দিষ্ট তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হল। এটি ছিল তাঁর দাবির সমর্থনে এক ঐশী নিদর্শন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমিই সেই মসীহ ও মাহদী যার আগমণ সংবাদ আঁ হযরত (সা.) দিয়ে রেখেছিলেন আর আমার আগমণের উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন তার স্রষ্টাকে চেনে এবং খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর মানুষ একে অপরের অধিকার প্রদান করে। সুতরাং, আমরা সেই শিক্ষাকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

জিহাদ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর অনুসারীরা মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর কাফেরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহন করেছেন। এরপর তিনি যখন মদিনা হিজরত করলেন, তখন শত্রুরা সেখানেও তাঁর উপর চড়াও হওয়ার ষড়যন্ত্র করল এবং আক্রমণ করলে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে আত্মরক্ষার অনুমতি দান করেন। জিহাদের অনুমতি দেওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের পক্ষ হইতে (শত্রুকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে। (সূরা হজ্জ: ৪১)

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা কেবল ইসলামেরই প্রতিরক্ষা করছি না, বরং ধর্মীয় উপাসনাগার,গীর্জাঘর এবং মঠের প্রতিরক্ষা করছি।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: নিউজিল্যাণ্ডে মাত্র কয়েকশ আমাদের সদস্য। এখানে আমাদের ইবাদতের জন্য জায়গা দরকার ছিল। তাই এই মসজিদটি আহমদীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে যাতে তারা এখানে এসে নামায পড়তে পারে এবং কিভাবে মানবতার সেবা করা যায় এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রসার করা যায় সে সম্পর্কে তারা পরিকল্পনা করতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমে এখানে একটি হলঘর ছিল যেখানে নামায পড়া হত। এখন যথারীতি মসজিদ তৈরী হয়ে গেছে। হলঘর থাকলেও মসজিদের প্রয়োজন ছিল। যথারীতি মসজিদ ভবন কতিপয় দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি আশা করি, এই মসজিদ একদিন এখানকার মানুষের জন্য অপর্যাপ্ত হয়ে পড়বে। আর এও সম্ভব যে নিউজিল্যাণ্ডে আরও মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন পড়বে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের বার্তা হল ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে। কেউই এই বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

মহিলাদের উদ্দেশ্যে

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আল হামদো লিল্লাহ। আজ আমি নিউজিল্যাণ্ডে বসবাসরত মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি।আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের জামাতের আহমদী মহিলারা সব সময়ই সুস্পষ্ট ভূমিকা রেখেছে। বস্তুত তাদের এমনটি করা জরুরীও বটে। এই কারণেই হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছিলেন, জামাতের পঞ্চাশ শতাংশ মহিলারা যদি নিজেদের পুরোপুরি সংশোধন করে নেয় তাহলে, এর দ্বারা এক প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হতে পারে। আপনাদের সংশোধন, বরং বলা যায়, যে কোনও জাতির মহিলাদের সংশোধন অত্যন্ত জরুরী বিষয়।কেননা আপনাদের ক্রোড়েই ভবিষ্যত প্রজন্ম লালিত হয়, আপনাদের মাধ্যমে তাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। যে কোনও জাতির সফলতার জন্য বংশ পরম্পরায় এমন স্পৃহা তৈরী করা জরুরী যার মাধ্যমে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং জাতির পরিচয় তৈরী হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে কোনও ধর্মীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য, বিশেষ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্দেশ্য অতি মহান। আমরা সেই জামাত যাদেরকে এই যুগে পৃথিবীতে প্রকৃত ইসলামের পুনরুত্থানের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। বস্তুত আমরা সেই কাজ করেও চলেছি। আমরা যদি নিজেদের দায়িত্বাবলী অনুধাবন না করি, তাহলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিরর্থক হবে, বরং তা একপ্রকার প্রবঞ্চনা হলে বিবেচিত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন আর সে সম্পর্কে আমি নিজের খুতবায় বার বার উল্লেখ করেছি যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উদ্দেশ্য হল মানুষকে খোদার নিকটবর্তী করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে তোলা। এই উদ্দেশ্য দুটিকে নিয়েই জামাত আহমদী এগিয়ে যাবে। আমাদের উন্নতি কিম্বা সফলতা জাগতিক উন্নতির শিখর স্পর্শ করার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আমাদের উন্নতির ভিত্তি জাগতিক কোনও উদ্দেশ্য অর্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমাদের সফলতা আধুনিক ফ্যাশন এবং নিত্যনতুন পথ অবলম্বন করার মধ্যে নিহিত নেই। বরং আমাদের সফলতা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নৈকট্য তৈরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের সফলতা কুআন করীমের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের সফলতা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণে। আমাদের সব সময় উন্নতি ও সফলতা অর্জনের সেই সব পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেমনটি আমি কালকের খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম যে, আমাদের খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হবে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে। সুতরাং, আপনাদের সকলকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি নিয়মানুবর্তী হতে হবে এবং নিয়মিত নামায পড়তে হবে। এবং আপনাদেরকে এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যে, আপনাদের সন্তানেরা নিয়মিত সমস্ত

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

ফরয নামায পড়ছে। স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে সন্তানের হৃদয়ে খোদা তা'লার মহত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করুন যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদা তা'লার ভালবাসায় নিমগ্ন হয় আর আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও আপনাদের কুরআন করীম পাঠ করা এবং অনুধাবন করার প্রতি মনেযোগ দেওয়া দরকার। প্রত্যেক আহমদী মহিলা ও বালিকা আসল আরবী কুরআন পড়তে পারে। এরপর এর অর্থ এবং ব্যাখ্যা শেখারও চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই সব বিষয় এড়িয়ে চলার চেষ্টাকরা উচিত যেগুলিকে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর পবিত্র শিক্ষা এবং উপদেশাবলী অনুধাবন করা এবং শেখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনকে সেই শিক্ষা অনুসারে পরিচালিত করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আয়েশা (রা.) –এর পক্ষ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আমরা নারীর সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহচর্যে থেকে এত জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন যে, আঁ হযরত (সা.)–এরমৃত্যুর পর হযরত আয়েশা (রা.) ধর্মীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বৈঠকের আয়োজন করতেন, যেখানে তিনি পর্দার অন্তরালে থেকে পুরুষদেরকেও শেখাতেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্মরণ রাখবেন যে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং এর প্রচলন হযরত আয়েশা (রা.)–এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি। বরং রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তাঁর সাহাবাগণ এবং সাহাবীয়াগণ মোমেনদের জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। তিনি (স.) বলেছেন, তাঁর সাহাবারা এমন ছিলেন যারা সিরাতে মুস্তাকিমকে আলোকিত করেছেন আর যে ব্যক্তি তাদেরকে অনুসরণ করবে সে হিদায়াত এবং সফলতা লাভ করবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, হযরত আয়েশা (রা.)–এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ছিল। তাঁর কতটা জ্ঞান ছিল যে, রুসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.)–এর কাছ থেকে অর্ধেক ধর্ম শিখে নিও। তাই আমাদের মহিলাদের জন্য হযরত আয়েশা (রা.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মহান ঐতিহ্য ও নীতিকে আজও অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহিলাদের এমনটি ধারণা করা উচিত নয় যে, কেবল নিজ পরিবারের দেখা শোনা করা, কাপড় স্ত্রী করা বা রান্না করাই তাদের দায়িত্ব। কিম্বা যে সব মহিলারা বাড়ির বাইরে চাকরী করছে, তারা অনেক কিছু অর্জন করে নিয়েছে এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয় । বস্তুত যেহেতু তারা আহমদী মহিলা, তাই আমাদের মহিলাদের উপর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সুতরাং তাদেরকে বেশি করে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা উচিত। আর তারা যা কিছু শেখে তার উপর আমলও যেন করে। আর সন্তানদেরকেও শেখায় এবং নিজেদের সমাজে ইসলামের প্রকৃত ও পবিত্র শিক্ষার প্রচার করে। এটি সশস্ত্র যুদ্ধের যুগ নয়,বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এই যুগকে কলমের যুগ এবং জ্ঞানের জিহাদের যুগ নামে আখ্যায়িত করেছেন। অতীতে মুসলমান মহিলাদের জন্য জিহাদের অংশগ্রহণ করা কঠিন ছিল। কেননা কাফেরার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করছিল আর ইসলামকে ধ্বংস করতে অস্ত্র প্রয়োগ করছি। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানেরা নিজেদের এবং নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করতে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। তবু এযুগের মিডিয়া এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আক্রমণ করা হচ্ছে। এই জন্যই, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই যুগকে কলমের যুগ নামে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, আজকের যুগের জিহাদে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার পথে কোনও অন্তরায় নেই। তারা আজকের যুগে জিহাদে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতেপারে। আর করাও উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাতে আমাদের মেয়ে এবং মহিলারা ছেলেদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত। আর আমার অনুমান, নিউজিল্যাণ্ডেও হয়তো অনুরূপ অবস্থা। তাই নিজেদের বুদ্ধিমত্তাকে যথাসম্ভব ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করুন আর সেই জ্ঞানকে ইসলামের প্রকৃত বাণীর প্রচার ও প্রসারের কাজে লাগান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের জামাতের মেয়েদের মর্যাদা এবং উদ্দেশ্যের দুটি অভিমুখ রয়েছে। এক, আহমদী মেয়েদের দায়িত্ব হল সংসারের দায়িত্ব এবং সন্তানের লালন পালনের বিষয়ে যত্নবান থাকা। অপরদিকে তবলীগের ক্ষেত্রে কাজ করা এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রসারও একজন আহমদী মহিলার কর্তব্য। এটি আপনাদের কাঁধে একটি বিরাট দায়িত্ব যা আপনাদের বুঝতে হবে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। একবার এক মহিলা সাহাবী আঁ হযরত (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন–"হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে মুসলমান মহিলাদের প্রতিনিধি হিসেবে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠানো হয়েছে যে, জিহাদ তো সমস্ত মুসলমানদের জন্য ফরয। কিন্তু মুসলমান মহিলাদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। যদি জিহাদের সময় মুসলমান পুরুষরা শহীদ হয়ে যায় তবে সে অতি উচ্চ সম্মান লাভ করে। অনুরূপভাবে যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে পড়ে, তবুও সে মহা প্রতিদান লাভ করে। যদি সে বিজয়ী হয়ে গাযি হিসেবে ফিরে আসে, তবুও আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজি লাভ করে। কিন্তু আমরা মহিলারা বাড়িতে স্বামী ও সন্তানদের দেখাশোনা করি আর তাদের অবর্তমানে সংসার সামলায়। আমরা কি প্রতিদান পাব? এমন কোনও পুণ্যকর্ম রয়েছে কি যা সম্পাদন করে আমার সেই পর্যায়ের পুরস্কার লাভ করতে পারি যা জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত?

রসুলুল্লাহ্ (সা.)উত্তর দেন: মুসলমান মহিলারা যদি স্বামীদের আনুগত্য করে, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে, ভালভাবে সংসারের দায়িত্ব পালন করে, সন্তানের উন্নত নৈতিক শিক্ষা দেয়, তবে তারাও অনুরূপ প্রতিদান পাবে যতটা তাদের স্বামীরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে লাভ করে। "

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, আপনারা সকলে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, এই যুগে তবলীগের জিহাদ রয়েছে যা যুগের ইমাম প্রবর্তন করেছেন। আজকের যুগে সশস্ত্র জিহাদ নেই, বরং বুদ্ধি, কৌশল এবং কলম হল আজকের যুগের অস্ত্র। অতএব, এই আধুনিক যুগে ইসলামের প্রতিরক্ষায় পুরুষরা যে ভূমিকা পালন করে, সেই একই ভূমিকা পালনের পথে মহিলাদের জন্যকোনও প্রতিবন্ধকতা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: উচ্চ শিক্ষার দিক থেকে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে আমাদের মহিলারা পুরুষদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। অতএব, আপনারা একদিকে যেমন নিজেদের সংসারের দেখাশোনা করছেন, স্বামীদের সেবা করছেন, তেমনি অপরদিকে আপনারা ইসলামের তবলীগের জন্য নিজেদের জ্ঞানকেও কাজে লাগাতে পারেন। অতএব, একথা স্পষ্ট যে, এই যুগে আপনারা পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ প্রতিদান অর্জনকারী হতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে সচরাচর একটি আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম নাকি এমন একটি ধর্ম যা মহিলাদেরকে সমান অধিকার দেয় না। আমি যে বিষয়টি বর্ণনা করেছি, আপনারা যদি কেবল এই একটি বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশ করেন,তবে জানতে পারবেন যে, এই যুগে মুসলমান মহিলাদের জন্য পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ প্রতিদান লাভের সুযোগ রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:এছাড়া ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার আরও একটি অনুষঙ্গ রয়েছে। রসুলুল্লাহ্ বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্য কর্তব্য। এখানেও মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করা হয় নি। বরং উভয়কে সম মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অন্যত্র হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে পরিবারে তিনটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছে আর তার পিতামাতা তাদেরকে পূর্ণ শিক্ষা দেয়, তাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়– সেই মেয়েরা তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে। অর্থাৎ মহিলাদের মর্যাদা উচ্চ, এতটাই যে, আল্লাহ্ তা'লা ত াদেরকে জান্নাত অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন। (ক্রমশ....)

যুগ ইমামের বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 7 April, 2022 Issue No. 14

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয়

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববতীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার।" (সূরা বাকারা: ১৮৬)আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ হল রোযা। এই রোযা বা উপবাস-ব্রত পালন সকল ধর্মেই কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়।

বছরের অসাধারণ ও অন্যতম একটি মাস হচ্ছে রমযান, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে।" (সূরা বাকারা: ১৮৬)বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতা এবং উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।"সূফীগণ লিখেছেন, "এ মাসে বান্দার আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া, এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশ্ফ' বা 'দিব্যদর্শন' লাভ হয়ে থাকে। নামায তাযকিয়া-এ নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি সাধন করে এবং রোযাতে 'তাজাল্লীয়ায়ে-কাল্ব (আত্মার উজ্জ্বলতা) সাধন হয়।"

রমযানের ইবাদত সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছেন, 'মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি।'আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য দৈহিক-সম্পর্ক কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ একান্তই প্রয়োজন। খোদা তা'লার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। ইসলাম ধর্মে মূলত এই রোযা পালনের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। অর্থাৎ ইসলাম রোযাকে পূর্ণ মাত্রার আত্মোৎসর্গ-স্বরূপ মনে করে থাকে। রোযার মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসের জন্য যেমন নির্দিষ্ট দরজা বা পথ থাকে, তেমনি ইবাদতের দরজা হল, 'রোযা', আর রোযাদারের দরজা হল 'রাইয়ান' নামক দরজা।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "রোযা ঢাল-স্বরূপ, দোযখের অগ্নি থেকে রক্ষা লাভের নিরাপদ দুর্গ।" পবিত্র রমযানের শিক্ষা হল, দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে রোযা রাখার পাশাপাশি ফরয ইবাদত আদায়ের সাথে রাত জেগে নফল ইবাদত করা, অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বসমূহ অনুধাবন করা। কারণ, কুরআন ও রমযান ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এ মাসে কুরআন তেলাওয়াত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী (সা.)-কে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কুরআন পুনরাবৃত্তি করে শোনাতেন। রমযানে বিনীতভাবে দোয়া করারপাশাপাশি ঝড়ের গতিতে দান-সদকাহ্ করতে থাকা, যার ওপরেও আদেশ প্রদান করা হয়েছে। নাফ্সের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করা আর বেশি বেশি যিকরে ইলাহী করা, যা আত্মাকে সতেজ রাখে। কম আহার গ্রহণে আত্মশুদ্ধি ও কাশ্ফি শক্তি বা দিব্যদর্শন-শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়। রোযাদার সর্বদা আল্লাহ্র হাম্দ, তস্বীহ ও তাহ্লীলের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয়-খাদ্য লাভের সৌভাগ্য হয়।"

(আল্-হাকাম, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)

"লাআল্লাকুম তাত্তাকুন" (সূরা বাকারা: ১৮৬)। রমযান মাস হলো তাক্ওয়া অর্জনের মাস। বান্দা নিজেদের মাঝে এক অভিনব পরিবর্তন সাধন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর নৈকট্যের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। সংযমী মনোভাব গড়ার পাশাপাশি তাক্ওয়া-ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং রূহানীয়াত লাভের পূর্ণ সুযোগ এনে দেয় এই মাস। অর্থাৎ, পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে সারা বছরের ঘাটতি পূরণের অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়।এই মাসের মধ্যে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ রাত হল "লায়লাতুল ক্বদর", যা হাজার রাত্রি অপেক্ষা উত্তম। এই রাতে অধিক হারে ইবাদত ও দোয়া করার পাশাপাশি কুরআন পাঠ এবং বেশি বেশি করে তওবা ও ইস্তেগফার করার অতুলনীয় সুযোগ এনে দেয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য এ রমযান সবদিক দিয়ে বরকতময় করুন, আমীন

(সৌজন্যে: পক্ষিক আহমদী, ১৫ই এপ্রিল, ২০২১)

ভালবাসার আবেগকে উস্কে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদিও কিতাব তোমার উপর নাযেল হয়েছে, কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য এই যে, সকলে এর থেকে উপকৃত হোক, তাই এটি সমগ্র জগতের জন্যই নাযেল হয়েছে। তবে এরা আল্লাহ্ তা'লার এই ভালবাসার কদর করে না কেন?

'নূযেলা ইলাইহিম' -এর বিষয়ের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে এই কিতাব সমগ্র পৃথিবীর কাছে পৌঁছনো জরুরী। কেননা এটি সমগ্র পৃথিবীর জন্য নাযেল হয়েছে আর এটি সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। তাই তাদের কাছে এটা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মুসলমানরা যদি এই বিষয়টি বুঝত এবং ইসলামের তবলীগের কর্তব্যে অবহেলা না করত, তবে আজ পৃথিবীতে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম চোখে পড়ত না। কেননা এর পবিত্র শিক্ষার সামনে অন্য কোন শিক্ষা দাঁড়াতেই পারে না । আজ অবশ্য এর প্রসারের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। কেননা, জাগতিক লোভ লালা ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থা তো আজ তৈরী হয়েছে। পূর্বে তো জগতও মুসলমানদের হাতে ছিল যেভাবে তাদের হাতে ধর্ম ছিল।

'লিতুবাইয়ানা'-য় আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি এই যে, কিছুগ্রন্থ এমনও আছে যেগুলিকে মানুষ লজ্জাবশত শোনাতে পারে না। যেমন বাইবেলের কিছু অংশ। কিন্তু কুরআন করীম এমন শিষ্টাচর পূর্ণ শিক্ষার সমষ্টি যে সর্বত্র তা শোনানো যেতে পারে।

একজন খৃষ্টানের স্বীকৃতি, 'কুরআনের বৈশিষ্ট্য হল এটি প্রত্যেক মজলিসে পড়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের গ্রন্থগুলি এমন যে প্রত্যেক মজলিসে সেগুলি পড়া যায় না।

হযরত লুত এবং তাঁর কন্যাদের ঘটনা, বনী ইসরাঈলদের মহিলা ও শিশুদেরকে খোদার আদেশে হত্যা করার ঘটনাগুলি এমনই যে প্রত্যেক মজলিসে সেগুলি বর্ণনা করা কঠিন বিষয়।আর্য সমাজীদের নিয়োগ'-এর শিক্ষাও তদনুরূপ। অন্য ধর্মের লোকেদের কথা না-ই বললাম, একজন আর্য সমাজী ধর্মাবলম্বী একজন স্বামী তার স্ত্রীকে সেই শিক্ষা পাঠ করে শোনাতে পারে না। কিন্তু কুরআন করীম এমন বিষয়ের সমষ্টি এবং এতে এমন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যে প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক বয়সের মানুষের সামনে পড়া যেতে পারে।

لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইলহাম মানুষের চিন্তাশক্তিকে প্রখর করে তোলে। সাহাবাদের দৃষ্টান্ত এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারা ছিল নিরক্ষর, যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। কিন্তু কুরআনের ইলহাম শুনে এবং অনুধাবন করে পৃথিবীর বিদ্বানদের শিক্ষক হয়ে উঠলেন। তাদেরকে এমন বোধশক্তি প্রদান করা হল যে, পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য তারা এক উৎকৃষ্ট শিক্ষা রেখে গেছেন।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১৭২)

রমযান প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেছেন:

"অনেক লোক ছোট ছোট কষ্টে ভীত হয়। এ শ্রেণীর লোকও সারা মাস রোযা রাখে এবং কষ্ট করে। এতে তারা প্রমাণ করে,তারা উপবাস করতে এবং এর কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম। এরূপে তাদের কষ্ট স্বীকার করার অভ্যাস হয়ে যায়। অতএব এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, ধর্মের সেবার জন্যে অধিকতর উদ্যমী হওয়া আবশ্যক এবং কষ্ট দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। লক্ষ্য করা উচিত, কাজ করার সংকল্প বা নিয়্যত করা ও না করার মাঝে কত প্রভেদ রয়েছে। রমযান মাসে নিয়্যত করা হয় যেন, রোযাদার দিবাভাগে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে। কিন্তু অন্য সময়ে এ নিয়্যত থাকে না বলে তখন দু ঘন্টার ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করা যায় না। সুতরাং নিয়্যত বা সংকল্পের দ্বারা বড় বড় কাজ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে আমাদের নিয়্যত এবং সংকল্পকে এভাবে দৃঢ় করে নেওয়া উচিত, যেন আমরা খোদার ধর্ম প্রচারে কোনও ত্রুটি না করি এবং ধর্মের বিষয়ে কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করি না।

(দৈনিক আল ফযল, ১২-২-১৯৬৪)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir